ইউনিট-২

বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা

(River System of Bangladesh)

পৃথিবীর বিখ্যাত নদী ব্যবস্থা গঙ্গা-পদ্মা, যমুনা-ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা-বরাক সহ অসংখ্যক নদ-নদীর দেশ (প্রকৃত নদী সংখ্যা বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন সঠিক তথ্য নেই। তবে কেউ কেউ বলেন, নদীর সংখ্যা ৭০০ থেকে ১০০০ এর মত, আবার কেউ কেউ বলেন, ২৫৩টি। অর্থাৎ মতান্তর থাকলেও যাদের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ২৪০০০ কিলোমিটার) হিসেবে পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রে বাংলাদেশ বেশ সুপরিচিত এবং তার মোট ভূভাগের ৮০ ভাগেরও বেশি ভূমি এসব নদ-নদী দ্বারা বাহিত পলল অবক্ষেপনের প্রতিদান। ফলে এদেশের শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক, রাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, যোগাযোগ ইত্যাদিসহ বিবিধ কর্মকান্ড আবর্তিত হচ্ছে এসব নদ-নদীকে কেন্দ্র করে। তাই নদ-নদীই এক কথায় অস্তিত্ব ও প্রাণ।

কোন উৎস হতে (পার্বত্য ভূমি, হ্রদ, বৃষ্টিবহুল স্থান, বরফ স্তুপ ইত্যাদি) নেমে আসা যে জলধারা সুদীর্ঘ খাতের মধ্যদিয়ে এঁকে বেঁকে নিয়ত প্রবাহমান, তাই নদী নামে পরিচিত। যে খাতের মধ্য দিয়ে জলধারা প্রবাহিত হয়, তাকে নদী উপত্যকা এবং উপত্যকার তলদেশ নদীগর্ভ নামে অভিহিত। অপেক্ষাকৃত ছোট নদী স্রোতস্বিনী, কোন একটি নদী অপর একটি নদীতে মিলিত হলে প্রথম নদীটিকে অপর নদীটির উপনদী এবং একটি নদী হতে অপর একটি নদীর উৎপত্তি/বিকাশ/সৃষ্টি হলে সৃষ্ট নদীটিকে মূল নদীর শাখা নদী বলে। উদাহরণস্বরূপ, মহানন্দা পদ্মা নদীর উপনদী আর গড়াই পদ্মার শাখা নদী। নদী যে স্থান থেকে উৎপত্তি বা সৃষ্টি হয় তাকে নদীর উৎস এবং যেখানে মিলিত হয় তাকে মোহনা বলে। একটি নদী ও তার উপনদীসমূহ একত্রে একটি নদী প্রণালী বা নদী ব্যবস্থা গঠন করে। নদী গঠনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত আয়তন ও গতিবেগ সম্পন্ন একাধিক প্রবাহের মিলিত ধারা যা অন্তস্থ ভূমি ও শিলার ক্ষয় সাধনের মাধ্যমে খাত সৃষ্টি তথা এগিয়ে চলে থাকে। একটি উৎস আধার নদীর নিয়মিত প্রবাহ সচল রাখতে সদা সচেষ্ট থাকে। উদাহরণস্বরূপ গঙ্গোত্রী হিমবাহ গঙ্গা নদীর উৎস হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদ-নদীই বার্ধক্য পর্যায়ে উপনীত হয়ে বঙ্গোপসাগরের পতিত হয়ে থাকে। তাছাড়া, উচ্চ ভূমি, ভূমির ঢাল ইত্যাদিও নদীর উৎপত্তিতে ভূমিকা রেখে থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ী ছড়া, সর্পিল মৌসুমী খাড়ি, স্বল্প পানি সমেত কর্দমাক্ত খাল-বিল ও নালা এবং প্রধান প্রধান নদী ও এদের উপনদী, শাখানদী, সম্মিলিতভাবে বিশাল নদী ব্যবস্থার গোড়া পত্তনে ভূমিকা রাখছে। সুন্দরবন, বরিশাল, খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চলে প্রচুর নদীনালা সত্যিকার অর্থে মনোরম জালের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। তবে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের সর্বত্র এ নদ-নদীগুলো সমভাবে বন্টিত নয়।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচেছ-

পাঠ ২.১ঃ বাংলাদেশের নদ-নদী ব্যবস্থাঃ একটি প্রেক্ষিত
পাঠ ২.২ঃ গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা
পাঠ ২.৩ঃ ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা
পাঠ ২.৪ঃ মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থা
পাঠ ২.৫ঃ বাংলাদেশে বন্যা

পাঠ-২.১

বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাঃ একটি প্রেক্ষিত

এই পাঠ পড়ে আপনি-

◆ ভিত্তি অনুযায়ী নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।

ভিত্তি অনুযায়ী নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাকে মূলতঃ ৫টি মৌলিক ভিত্তির আলোকে ভাগ করা যায়, যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

নদী ব্যবস্থা

উৎপত্তিগত স্থান | নদী দৈর্ঘ্য | খাত প্রণালী | অববাহিকা | পানিতাত্ত্বিক নিষ্কাশন প্রণালী

নিম্নে ভিত্তি অনুসারে নদী ব্যবস্থার বর্ণনা করা হলোঃ

১. উৎপত্তি অনুসারেঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নদীর উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও ঢাল বিশিষ্ট উৎস ভূমি। সাধারণতঃ পাহাড়িয়া অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত, বরফগলন, সরোবর, বা হ্রদ ইত্যাদির অবস্থানসমূহ স্বাভাবিক ভাবেই নদ-নদীর উৎপত্তি স্থল হিসেবে পরিচিত। যেমন- গঙ্গা বা পদ্মা নদী হিমালয় পর্বতের বৃষ্টি, বরফগলা পানি ও প্রস্রবন একত্রে মিলিত হয়ে উৎপত্তি লাভ করেছে। এ ছাড়া আরো অনেক নদ-নদীর সূতিকাগার হিসেবেও পরিচিত। উৎপত্তি অনুসারে (ক) পার্বত্য নদী ও (খ) আঞ্চলিক এ দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

ক) পার্বত্য নদ-নদীঃ

পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রবাহিত নদীকে পার্বত্য নদী হিসেবে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ পার্বত্য নদীগুলো হিমবাহ, সরোবর বা বহুল পরিমাণে বৃষ্টির পানির স্থানসমূহ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যেমন- গঙ্গা বা পদ্মা, তিস্তা (হিমবাহ থেকে), ব্রহ্মপুত্র (মানস সরোবর থেকে) মেঘনা-বরাক (আসামের নাগমনিপুর পাহাড় থেকে) ইত্যাদি।

খ) আঞ্চলিক নদীঃ

দেশের অভ্যন্তরস্থ কোন বড় বিল বা জলাশয় থেকে উৎপত্তি লাভ করে স্বল্প দুরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাদেরকে আঞ্চলিক নদী বলা হয়। এ নদীগুলো স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন, আকারে অনেক ছোট এবং সারা বছর পানি নাও থাকতে পারে, তবে বর্ষার সময় বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন- বড়াল, তুরাগ, ইছামতি, দেউলী, কুলীক ইত্যাদি।

গ) জাতীয় নদীঃ

দেশের অভ্যন্তরে উৎপত্তি লাভ করে প্রবাহধারা ঐ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে, তাকে জাতীয় নদী বলে। এ নদীগুলো আকারে ছোট হলেও সারা বছর পানি থাকে, যেমন- আত্রাই, কপোতাক্ষ ইতাাদি।

ঘ) আন্তর্জাতিক নদী

একাধিক দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জলধারা আন্তর্জাতিক নদী নামে অভিহিত। এ নদীগুলোর উৎপত্তিস্থলও প্রবাহপথ সীমাবদ্ধ নয়, প্রবাহের পরিমাণ বেশ বেশি, সারা বছর প্রবাহ বজায় থাকে। যেমন- পদ্মা (গঙ্গা), ব্রহ্মপুত্র/যমুনা ইত্যাদি। এদেরকে আবার সীমান্তবর্তী নদীও বলা হয়।

২. নদীখাতের ধরন অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগঃ

নদীতে নিয়মিত পানি সরবরাহ, ঋতুভেদে পানি সরবরাহের হ্রাসবৃদ্ধি, ভূমিরূপ, মাটির গঠন ও বুনন এবং ভূমির ঢালের তারতম্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশসহ বাংলাদেশে প্রধানতঃ তিন প্রকার নদী ব্যবস্থা গড়ে উঠে, যেমন- ক) সরল নদীখাত, খ) সর্পিল নদীখাত এবং গ) বিনুনী নদীখাত।

চিত্র ২.১.১

ক) সর্পিল নদীখাত

সমভূমি বিশেষ করে পলি গঠিত সমভূমি অঞ্চলে বাক বহুল নদী দৃষ্টিগোচর হয়। এ সব নদীর প্রবাহ পথ বেশ গভীর, আঁকাবাঁকা প্রবাহপথ, পুনঃপুনঃ খাতের দিক পরিবর্তন, বাঁকে ভাঙ্গন ক্রিয়া বিপরীতে চর গঠন এবং প্রবাহ পথ এক খাতে প্রবাহিত হয়। যেমন- পদ্মা।

খ) বিনুনী নদীখাত/চরোৎপাদী নদী

যে সকল নদী একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয় তাদেরকে বিনুনী বা চরোৎপাদী নদী বলা হয়। বিনুনী সদৃশ বলে একে বিনুনী এবং প্রবাহ পথে চর উৎপাদিত হয় বলে চরোৎপাদিত নদী বলা হয়। নদীতে শেষ পর্যায়ে অতিরিক্ত সঞ্চয়জাত পললের কারণে চর পড়ে মূল স্রোত ধারাকে দ্বিধা বা বহুধা খাতে বিভক্ত করে প্রবাহিত হয়। এসব নদীর প্রশস্ততা বেশি, গভীরতা কম, প্রবাহ পথে চর গঠন এবং পরিশেষে একাধিক খাতে প্রবাহিত হয়ে থাকে। যেমন- যমুনা নদী।

গ) সরল নদী

যে সব নদ-নদী প্রবাহ পথে কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই মোটামুটি সোজাপথে প্রবাহিত হয় তাদেরকে সরল নদী বলা হয়। কঠিন শিলায় গঠিত অঞ্চল ভূ অভ্যন্তরে ভৌত পানি প্রবাহ এবং নদীতীর বাঁধা দিয়ে নদী খাত সরল করা হয়। যেমন- তিস্তা।

৩. অববাহিকা অনুসারে শ্রেণীবিভাগ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের ভূভাগের ৮০ ভাগের বেশি অংশ বিখ্যাত তিনটি নদী ব্যবস্থা ও তাদের অসংখ্যক শাখা ও উপনদীর সম্মিলিত কার্যকলাপ তথা বাহিত পলল দ্বারা গঠিত হয়েছে সেহেতু এসব নদী ব্যবস্থা প্রত্যেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বলীয়ান হয়ে অববাহিকা গঠন করেছে। অববাহিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন- ক) গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা, খ) ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা গ) মেঘনা-বরাক নদী ব্যবস্থা এবং ঘ) দক্ষিণ পূর্বাংশের নদী ব্যবস্থা বা পাহাড়ী নদী ব্যবস্থা।

গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা

গঙ্গা বা পদ্মানদী ও এর শাখা প্রশাখা গাঙ্গেয় বদ্বীপ নদীমালার অন্তর্গত। এ নদীমালার প্রধান নদী পদ্মা। পদ্মা এর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত কয়েকবার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। গঙ্গার অসংখ্য শাখা নদী আছে। বাংলাদেশে গঙ্গার অধিকাংশ শাখা নদীই দক্ষিণে বদ্বীপ ভূমির মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। নিম্নে পদ্মা ব্যতীত অন্যান্যগুলোর বিবরণ দেয়া হলোঃ

গঙ্গা বা পদ্মাঃ গঙ্গা হিমালয়ের গাঙ্গেত্রী নামক হিমবাহ হতে উৎপন্ন হয়ে ভারতের উপর দিয়ে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা দিয়ে গঙ্গা-পদ্মা নামে প্রবাহিত হচ্ছে। এর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ২ হাজার ৬ শত কিলোমিটার। বাংলাদেশ অংশে এর দৈর্ঘ্য ৩৮০ কিমি। রাজশাহী থেকে দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মা নদী যমুনার সাথে মিশে চাঁদপুর পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। সেকালে পদ্মা ছিল প্রমত্তানদী। এখন শুষ্ক মৌসুমে এ নদী শুকিয়ে যায়। কারণ নদীর উজানে ফারাক্কা নামক স্থানে বাধ দিয়ে মূল নদীর পানি প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে।

ভৈরবঃ নিষ্ক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। ভৈরব নদী কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০ কিমি। খুলনায় এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮ কিমি। ইছামতি ও কপোতাক্ষ ইহার দুটি প্রধান শাখানদী। ভৈরব নদী কোথাও কোথাও তার নাব্যতা হারিয়েছে।

কপোতাক্ষঃ যশোর ও খুলনার প্রায় ২৫৭ কিমি দীর্ঘ কপোতাক্ষ নদী দক্ষিণে সুন্দরবনের ধার ঘেঁষে বয়ে চলেছে। যশোরে এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৮ কিমি। এই নদী খুলনার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে ভৈরবের সাথে মিশেছে। ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় সব নদীই স্রোতহীন জীর্ণশীর্ণ মৃতপ্রায়।

গড়াইঃ কুষ্টিয়া শহরের কাছ দিয়ে বয়ে চলা পদ্মার শাখা নদী গড়াই কুষ্টিয়ার দক্ষিণ পূর্ব দিক হয়ে রাজবাড়ি, ফরিদপুর এবং নড়াইল জেলার সীমানা ঘেষে প্রবাহিত হচ্ছে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে এ নদী মধুখালী থানার কাছে আবার এক সাথে মিলেছে। এরপর থেকে গড়াই নাম পরিবর্তন করে মধুমতি হয়েছে। মোল্লাহাট থানার কাছে এ নদীর সাথে কুমার, নবগঙ্গা, ও চিত্রা নদী মিশেছে। সুন্দরবনের কাছে এ নদী হরিনঘাটা নামে পরিচিত।

আড়িয়াল খাঁঃ গোয়ালন্দের সাড়ে ১০ কিমি দক্ষিণে টেপাখোলা সীমানায় ফরিদপুর খাল পদ্মার ডানতীর থেকে নির্গত হয়েছে এবং কুমার নদীর সাথে মিশেছে। এ নদী এঁকেবেঁকে ফরিদপুর জেলার উত্তরাংশে প্রবাহিত হয়ে মাদারীপুর জেলার শিবচরের কাছে আড়িয়াল খাঁ নদীতে পড়েছে। উনিশ শতাব্দীর শেষের দিকে আড়িয়াল খাঁ পদ্মার প্রধান ধারা ছিল। কিন্তু

বর্তমানে এর শেষ প্রান্তে বালি ভরাট হয়ে চর পড়েছে। মাদারীপুরের কাছে আড়িয়াল খাঁ দুটো শাখায় বিভক্ত হয়েছে। বাম দিকে নিজ নামেই এবং ডানদিকে টরকি নামে প্রবাহিত হচ্ছে।

পশুর রূপসাঃ পশুর নদী রূপসা নদীরই অব্যাহত অংশ। এখন গড়াই নদীর স্থলে এ নদী নাব্য। বটিয়াঘাটার কাছে রূপসা নাম পরিবর্তন করে 'কাজিবাচা' নাম ধারণ করেছে। পরে অবশ্য চালনার কাছে তা পশুর নামে পরিচিত। মংলা বন্দরের কাছে পশুর নদীতে মংলা নদী মিশেছে।

ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা

ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ও এদের শাখা প্রশাখা নিয়ে ব্রহ্মপুত্র যমুনা নদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ইহা দেশের প্রধান নদী ব্যবস্থা।

ক) পুরাতন ব্রহ্মপুত্রঃ বাহাদুরাবাদ ঘাটের উত্তর মূল ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে এ নদী জামালপুর, ময়মনসিংহ, জেলার দক্ষিণ পূর্বদিক দিয়ে ভৈরব বাজারের কাছে মেঘনার সাথে মিশেছে। শুকনো মৌসুমে এ নদীতে জলপ্রবাহ তেমন একটা হয় না বললেই চলে। বর্ষা মৌসুমে সীমান্তের ওপার থেকে আসা অতিরিক্ত পানি উপচে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে প্রবেশ করে। তখনই এ নদী পরিপূর্ণ থাকে।

খ) যমুনাঃ তিব্বতের মানস সরোবর থেকে উৎপত্তি লাভ করে গারো পাহাড় দিয়ে ধুবড়ীর কাছে ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ব্রহ্মপুত্র নদীই দক্ষিণে কিছুদুর এগিয়ে পশ্চিমে তিস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের মিলিত স্রোতধারা যমুনা নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে এবং গোয়ালন্দের কাছে এসে পদ্মার সাথে মিশেছে। এখন পুরাতন ব্রহ্মপুত্র যমুনার একটি শাখা নদী।

গ) ধলেশ্বরীঃ টাঙ্গাইল জেলার উত্তরে যমুনা নদী থেকে ধলেশ্বরীর উৎপত্তি এবং সাভারের কাছে এর নাম ধলেশ্বরী হয়েছে। এটি দুটি শাখায় বিভক্ত। প্রধান শাখা মানিকগঞ্জের উত্তর ও দক্ষিণ পূর্বে ৪৮ কিমি দীর্ঘপথ বয়ে চলেছে। দক্ষিণাংশ কালিগঙ্গা নামে পরিচিত, লৌহজং এর কাছে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে উত্তরে বুড়িগঙ্গা এবং দক্ষিণে ধলেশ্বরী নামে প্রবাহিত হয়েছে। বুড়িগঙ্গা ঢাকার দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফতুল্লার কাছে ধলেশ্বরীতে মিশেছে। আবার ধলেশ্বরী নারায়নগঞ্জের কাছে শীতলক্ষার সাথে মিলিত হয়েছে।

সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থা

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থার অন্তর্গত। প্রধানত সুরমা কুশিয়ারা ও মেঘনা এবং এদের শাখা প্রশাখা নিয়ে এই নদী ব্যবস্থা গঠিত।

ক) সুরমাঃ আসামের বরাক নদী কদরপুরের কয়েক কিমি পশ্চিমে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলায় প্রবেশ করেছে। দক্ষিণের শাখা কুশিয়ারা নামে সিলেটের মধ্যদিয়ে দক্ষিণ পুর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। উত্তরের শাখা সুরমা প্রথমে পশ্চিমে এবং পরে দক্ষিণ পশ্চিমে সিলেট শহরের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

খ) কুশিয়ারাঃ ভারতের মিজোরাম প্রদেশের পাহাড় থেকে উৎপন্ন ধলেশ্বরী নদী ও আসামের শিলাচরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া আর একটি নদী পরস্পর আসামের বদরপুরে মিলিত হয়ে যৌথপ্রবাহ সিলেটের করিমগঞ্জের উপর দিয়ে কুশিয়ারা নামে বাংলাদেশে প্রবাহিত হচ্ছে। এই নদীর মূল প্রবাহ সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ বালাগঞ্জ হয়ে মৌলভীবাজারের মনু নদীর সাথে মিশেছে এবং বরাক নদীর দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে। বরাক নদী হবিগঞ্জে খোয়াই নদীতে মিশেছে এবং দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে মদনার কাছে কালনি নদীতে মিলিত হয়েছে। এ মিলিত স্রোত ভৈরববাজারের কাছে মেঘনা নদীতে পড়েছে।

গ) মেঘনাঃ মদনার কাছে কালনী এবং হবিগঞ্জে বরাক ও খোয়াই নদীর মিলিত স্রোত মেঘনা নদী নামে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে। ভৈরববাজারের কাছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী মেঘনা নদীতে মিশেছে। বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষার মিলিত ধারা মুন্সিগঞ্জের কাছে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। মেঘনা নদী দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে পদ্মার সাথে এক হয়ে আরো দক্ষিণে চাঁদপুরের কাছে প্রশস্ত মেঘনা নদীর রূপ নিয়েছে। মেঘনা নদীর মোট দৈর্ঘ্য ৪১৬ কিমি (প্রায়)।

ঘ) গোমতীঃ কুমিল্লার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া গোমতী নদী দাউদকান্দির কাছে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই অঞ্চলের অন্যান্য নদী হচ্ছে ফেনী নদী ও ডাকাতিয়া নদী। ডাকাতিয়া নদী নোয়াখালীর দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। খরস্রোতা নদী ফেনী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে মেঘনা মোহনার কাছে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

পাহাড়ী নদী ব্যবস্থা

বাংলাদেশের দক্ষিণ পুর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার জেলার নদী ব্যবস্থা সমূহকে পাহাড়ী নদী ব্যবস্থা বলে। এই অঞ্চলের নদীগুলি অপ্রশস্ত, খরস্রোতা ও মোটামুটি সমান্তরাল। নিম্নে এই অঞ্চলের নদী ব্যবস্থা আলোচিত হলোঃ

ক) কর্ণফুলীঃ পাহাড়ী নদী হিসেবে কর্ণফুলী নদী বিখ্যাত। লুসাই পাহাড়ের লংলেহ নামক স্থানে এ নদীর উৎপত্তি। উৎস থেকে কর্ণফুলীর মোহনা পতেঙ্গা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭২ কিমি পাহাড়ের উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে বলে এ নদী খুবই খরস্রোতা। নদীর গতিবেগ উপত্যকার ঢালের সমানুপাতিক। এই নদী ভারত বাংলাদেশের প্রায় ৫ কিমি সীমা নির্দেশ করে। এ নদী সীমান্ত থেকে প্রবেশ করে রাঙামাটির সমভূমিতে প্রবাহিত হয় এবং পরে কাপ্তাই হ্রদে মিশে। কাপ্তাই হ্রদের দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে বেরিয়ে পতেঙ্গার কাছে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

খ) সাংগুঃ বান্দরবনের দক্ষিণে মউডাক পর্বতমালায় এ নদীর উৎপত্তি এ নদী এঁকেবেঁকে উত্তর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪৪ কিমি। কর্ণফুলী নদীর মোহনা থেকে কয়েক কিমি দক্ষিণে সাংগু নদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এ নদীর উচু পাহাড়ী অংশে ছোট ছোট জলপ্রপাত ও নদীপ্রপাত দেখা যায়।

গ) হালদা ঃ হালদা নদী পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলার বাদনা তলী পর্বতশৃঙ্গে উৎপন্ন হয়েছে এবং ফকিটছড়ি থানার উত্তর পূর্ব কোন দিয়ে চট্টগ্রাম জেলায় প্রবেশ করেছে। এ নদী উত্তর দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বিবিরহাট, নাজিরহাট, সাতারহাট, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, রাউজান ও চট্টগ্রামের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। এ নদী চট্টগ্রামের কালুর ঘাটের কাছে কর্ণফুলী নদীতে পড়েছে।

ঘ) মাতামুহুরীঃ পার্বত্য বান্দরবন জেলার মইনভার পর্বতে এই নদীর উৎপত্তি। উৎপত্তি স্থল থেকে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিম দিকে এসে মহেশখালী ঘাটের সাথে মিশেছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কিমি।

ঙ) নাফঃ বাংলাদেশের একেবারে দক্ষিণ সীমা বরাবর যে নদী মায়ানমার ও কক্সবাজারের টেকনাফ সীমা নির্দেশ করছে সেটি হচ্ছে খরস্রোতা নাফ নদী। পাহাড়ী কয়েকটি স্রোতস্বিনী নাফ নদী সৃষ্টির হয়েছে। এ নদী বঙ্গোপসাগেরে পতিত হয়েছে। নাফ নদীর দৈর্ঘ্য মাত্র ৫৬ কিমি।

৪) পানিতাত্ত্বিক ও নিষ্কাশন প্রণালী অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড মূলত উপরোক্ত পানিতাত্ত্বিক ও নিষ্কাশন প্রণালীর বৈশিষ্টের ভিত্তিতে ৪টি ভাগে বিভক্ত করেন, যেমন- ক) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নদীমালা, খ) উত্তর পূর্বাঞ্চলের নদীমালা, গ) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীমালা ও ঘ) দক্ষিণ পূর্বাংশের নদীমালা।

৪.১) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নদীমালা

রাজশাহী বিভাগের সমস্ত জেলাই এ অঞ্চলের অন্তর্গত। পশ্চিম ও উত্তর ভারতীয় সীমান্ত এলাকা, পূর্বদিকে যমুনা নদী এবং দক্ষিণে পদ্মা নদী দ্বারা ইহা পরিবেষ্টিত। ভূ-প্রকৃতিগতভাবে এটি হিমালয়ের পাদদেশীয় ভূমি প্লায়োস্টোসিন যুগের চত্বর সমূহের অবস্থান ও বেশ কিছু নিম্ন জলাভূমির অবস্থান রয়েছে। আর ভূমির ঢাল তুলনামূলকভাবে খাড়া প্রকৃতির, নদীগুলো দীর্ঘ প্রকৃতির, গভীরতা বেশি। অববাহিকায় অধিক বৃষ্টি হয় এবং পানি প্রবাহিত হয়। উদাহরণস্বরূপ মহানন্দা, চপা, পূণর্ভবা, টাঙন, কুলিক, তালমা, করতোয়া, আত্রাই, গুর, গুমানী, দিওনাই, চাতালকাটা, যমুনেশ্বরী, বাঙালী, নাগর, তিস্তা, মানস, দুধকুমার, ঘাঘট, হুরাসাগর, ধরলা ইত্যাদি।

ক) তিস্তা নদীঃ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে তিস্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। ১৭৮৭ সালে এক ভূ-আলোড়নের বা ভূমিকম্পের ফলে এর গতি পরিবর্তন হয়ে যায়। বর্তমানে প্রবাহিত জীর্ন করতোয়া, আত্রাই, যমুনেশ্বরী, নদীর উৎস হচ্ছে এই তিস্তা নদী। তিস্তা নদী প্রায় ১৭৬ কিমি দীর্ঘ। চিলমারীর দক্ষিণে তিস্তা ব্রক্ষপুত্রে গিয়ে মিশেছে।

খ) ঘাঘটঃ তিস্তার শাখা নদী হচ্ছে ঘাঘট। এই নদী গাইবান্ধা জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফুলছড়ি ঘাটের কাছে ব্রক্ষপুত্রের সাথে মিশেছে।

গ) করতোয়াঃ করতোয়ার উত্তরাংশকে দিনাজপুরের করতোয়া বলে। খানসামার কাছে বুড়িতিস্তার সাথে মিশে এটি আত্রাই নাম ধারণ করেছে। আবার দক্ষিণে গাইবান্দার কাছে করতোয়া নামে প্রবাহিত হচ্ছে। ইহাকে অবশ্য ব্রক্ষপুত্রের উপশাখা নদী হিসেবে গণ্য করা হয়।

ঘ) আত্রাইঃ তিস্তার শাখা নদী আত্রাই। খানসামার উত্তরে করতোয়া নামে প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদী ছোট যমুনার সাথে মিশে এবং দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত হয়ে পাবনার বেড়া থানার কাছে মূল যমুনা নদীতে পড়ে।

ঙ) ধরলা ও দুধকুমারঃ তিস্তার সমান্তরালে একেবারে উত্তরের এই নদী দুটি ব্রক্ষপুত্রের উপনদী। দুধকুমার খরস্রোতা নদী। ধরলা বর্ষার সময় খুবই খরস্রোতা হয়। কিন্তু শুকনো মৌসুমে এই নদী দুটি শান্ত থাকে।

চ) পুনর্ভবাঃ এটি তিস্তার শাখা নদী। রাজশাহী চাপাইনবাগঞ্জ জেলার উত্তরে এ নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। দিনাজপুর শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিম ও পশ্চিম কেন্দ্রীয় বরেন্দ্র অঞ্চলের মধ্যদিয়ে সরাসরি দক্ষিণে এগিয়ে রাজশাহীর মোহনপুরে মহানন্দার সাথে মিশেছে।

ছ) বাংগালীঃ তিস্তার শাখা ঘাঘট নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙালী নদী ব্রহ্মপুত্র নদীতে পড়েছে। যমুনা নদীর সাথে এর সংযোগ রয়েছে।

৪.২) উত্তর পূর্বাঞ্চলের নদী ব্যবস্থা

ফরিদপুর জেলা ছাড়া ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলা, সিলেট ও গোমতী নদীর উত্তরে কুমিল্লার কিয়দংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। প্রায় সমস্ত পলল ভূমি সমেত উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব সীমানায় কিছু পাহাড়, সিলেট ও ময়মনসিংহের হাওড়, নিম্নভূমি এবং ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল ও ঢাকা জেলার মধুপুর ও ভাওয়ালের উচ্চভূমি এই অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান। বড় আঙ্গিকে এ অঞ্চলে দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন-

ক) শাখা নদী যেগুলো পাহাড় থেকে নেমে এসে মেঘনা নদী ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে যেমন খোজাই, সুতাং, তিতাস এবং হালদা ইত্যাদি।

খ) ব্রহ্মপুত্র যমুনার উপনদী বিভিন্ন নামে মেঘনাতে পতিত হচ্ছে যেমন বংশী, বানার, ধলেশ্বরী, সারি, যদুকা এবং সোমেশ্বরী ইত্যাদি। তাছাড়া সুরমা, কুশিয়ারা, গোমতী, মনু, সালদা, পিয়ান, ছোট ফেনী এবং ডাকাতিয়া ইত্যাদি রয়েছে।

৪.৩) দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের নদী ব্যবস্থাঃ

বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়াসহ ফরিদপুর, বরিশাল, এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এর উত্তরে পদ্মা নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ভারতীয় সীমান্ত এবং পূর্বে মেঘনা নদী অবস্থিত। ভূপ্রাকৃতিক দিক থেকে সমগ্র অঞ্চলটি মৃতপ্রায় বদ্বীপ ভূমির অন্তর্গত এবং ভূমির ঢাল সাধারণত উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রতি কিলোমিটারে ৮ সেন্টিমিটার। পূর্ব ও দক্ষিণে পূর্বাংশ বন্যা, সাইক্লোন, লবণাক্ততা ছাড়াও জোয়ার ভাটা সহ অসংখ্যক নদীখাত এ অঞ্চলে বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য নদীগুলোর মধ্যে গড়াই মধুমতি, আড়িয়ালখা, কপোতাক্ষ, বিশখালী, রূপসা, পশুর, শিবসা, মাথাভাঙ্গা, বেতনাএ চন্দনা, চিত্রা ভদ্রা ধলেশ্বর, গোমনিত এবং নবগঙ্গা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৪.৪) দক্ষিণ পুর্বাংশের নদী ব্যবস্থাঃ

এ অঞ্চলের পূর্বে ভারত ও মায়ানমার, উত্তরে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অংশ পশ্চিমে মেঘনা নদী এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। এখানকার নদীগুলো অধিকাংশ পাহাড় থেকে আসে বলে একে পাহাড়ীয়া নদী ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। ক্ষয়গঠন ও সঞ্চয় প্রক্রিয়া নিত্য কর্মকান্ড, স্বাভাবিক বন্যা ও পাহাড়ী বন্যার আওতাধীন। নদীগুলো খরস্রোতা এবং জোয়ারভাটা ইত্যাদি এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য, নদীগুলো হচ্ছে ফেনী, মাতামহুরী, সাংগু, কাসালং, কাপ্তাই, নাফ এবং জাফলং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৫) দৈর্ঘ্যভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

মোটামুটিভাবে এ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ৮ টি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমনঃ

ক) অতি দীর্ঘনদীঃ যে সকল নদী ২৫০০ কিমি বা তার চেয়ে বেশি দীর্ঘ এ প্রকৃতির নদী বাংলাদেশে নেই।

খ) দীর্ঘ নদীঃ যে সকল নদী ২৫০০-১৫০০ কিমি এর মধ্যে তারাই এর প্রকৃতির এবং বাংলাদেশে এ ধরনের কোন নদী নেই।

গ) মধ্যম দীর্ঘ নদীঃ ১৫০০-১০০০ কিমি দীর্ঘ বিশিষ্ট নদীই দীর্ঘ প্রকৃতির নদী। বাংলাদেশে এ ধরনের কোন নদী নেই।

ঘ) মধ্যম নদীঃ ৫০০-১০০০ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নদীকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- ভৈরব (৫৫৯) করতোয়া, আত্রাই, হুরাসাগর, গোমানী (৮৪১) ইত্যাদি।

ঙ) নিম্ন মধ্যম নদীঃ ২৫০-৫০০ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নদীকে বুঝায়। যেমন- ইছামতি, কুমার, তিস্তা সাংগু ইত্যাদি।

চ) নিম্ন দৈর্ঘ্যের নদীঃ ১০০-২৫০ কিমি বিশিষ্ট নদীকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- কর্ণফুলী, মাথাভাঙা, নবডাঙা, নাগর ইত্যাদি।

ছ) অতি নিম্ন দৈর্ঘ্যের নদীঃ ৫০-১০০ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নদীকে বুঝায়। যেমন- মহানন্দা, ধরলা ইত্যাদি।

জ) ক্ষুদ্রাকৃতিক নদীঃ ৫০-১০০ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নদী যেমন- বড়াল, বুড়িগঙ্গা।

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাজনের ভিত্তি করে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উল্লিখিত ৪টি নদী ব্যবস্থা নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হলো।

পাঠসংক্ষেপঃ

এই পাঠ পড়ে আপনি ভিত্তি অনুযায়ী নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ**

১.১. নদীর উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন .... পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও ... উৎস .... ।

১.২. বাংলাদেশের বেশির ভাগ .... নদীগুলো হিমবাহ, ... বা বহুল পরিমাণে .... পানির স্থানসমূহ থেকে .... হয়েছে।

১.৩. একাধিক দেশের মধ্যে দিয়ে ....আন্তর্জাতিক .... নামে অভিহিত।

১.৪. কঠিন শিলায় গঠিত .... ভৌত পানি প্রবাহ এবং .... বাঁধা দিয়ে নদী .... সরল করা হয়।

১.৫. নদীর .... উপত্যকার .... সমানুপাতিক।

১.৬. বাংলাদেশের একেবারে... সীমা বরাবর যে নদী .... ও কক্সবাজারের.... সীমা নির্দেশ করছে সেটি হচ্ছে খরস্রোতা .... নদী।

১.৭. এখানকার নদীগুলো .... পাহাড় থেকে আসে বলে ইহাকে .... বলা হয়ে থাকে।

২. **সঠিক উত্তরের পার্শ্বে ‘স’ এবং মিথ্যা উত্তরের পার্শ্বে ‘মি’ লিখুনঃ**

২.১. একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জলধারা আন্তর্জাতিক নদী নামে অভিহিত।

২.২. সমভূমি বিশেষ করে পলি গঠিত সমভূমি অঞ্চলে বাক বহুল নদী দৃষ্টিগোচর হয়।

২.৩. পাহাড়ী নদী হিসেবে কর্ণফুলী নদী বিখ্যাত।

২.৪. বান্দরবনের দক্ষিণে মউডাক পর্বতমালায় সাংগু নদীর উৎপত্তি।

২.৫. হালদা নদী পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলার বাদনা তলী পর্বতশৃঙ্গে উৎপন্ন হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুনঃ

১. উৎপত্তি অনুসারে বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগের বিবরণ দিন।

২. নদী খাতের ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

৩. অববাহিকা ভিত্তিক বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

৪. পানিতাত্ত্বিক ও নদী নিষ্কাশন প্রণালীভিত্তিক বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

৫. দৈর্ঘ্যভিত্তিক বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

৬. উত্তর পশ্চিমাঞ্চল/উত্তরাঞ্চল/পাহাড়ী/দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল/দক্ষিণ পূর্বাংশের নদী বাবস্থার শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ভিত্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন ও তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২. ‘বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাঃ একটি প্রেক্ষিত’, আলোচনা করুন।

পাঠ-২.২

গঙ্গা-পদ্মানদী ব্যবস্থা

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ◆ গঙ্গা-পদ্মা নদীর উৎপত্তি ও প্রবাহপথ;
- ◆ গঙ্গা-পদ্মা নদীর গাঠনিক বৈশিষ্ট্যাবলী;
- ◆ গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী;
- ◆ গঙ্গা-পদ্মা নদীর শাখা নদী ও উপনদী সমূহ; এবং
- ◆ গঙ্গা-পদ্মা নদী ও ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কে ধারণা লাভ পারবেন।

গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা পৃথিবীর বৃহৎ নদীপ্রণালীর মধ্যে অন্যতম এবং এ নদী ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা বাংলাদেশের ভূমি, বসতি, কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও যাতায়াত ব্যবস্থা অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে অবদান রাখছে। এক কথায় এ নদী ব্যবস্থা বাংলাদেশের জনগণের জন্য অতি গুরূত্বপূর্ণ।
ভারত ও তিব্বত সীমান্ত নিকটবর্তী মধ্য হিমালয়ের গাড়োয়াল পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত গঙ্গোত্রী (৩০°৫৯ উত্তর ও ৭৮°৫৯ পূর্ব উচ্চতা ৭২৫০ মিটার, পুরুত্ব ২৩৬ কিমি এবং পরিধি ৭০ মাইল) নামক হিমবাহ থেকে গঙ্গা (পদ্মা) নদী উৎপত্তি লাভ করেছে। গঙ্গোত্রী হিমবাহের পূর্বদিক থেকে আগত অলকানন্দ ও পশ্চিম দিক থেকে আগত ভাগীরথীর সংগমস্থল দেব প্রয়াগ এর দক্ষিণ থেকে মিলিত ধারা গঙ্গা নামে পরিচিত। শিবালিক পর্বতমালা অতিক্রমের পর দক্ষিণবাহী হয়ে হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা সমতল ভূমিতে পতিত হয়েছে। এরপর দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে এলাহাবাদের নিকট যমুনা ও সরস্বতী নদী গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। পাটনার কিছু পূর্বে ঘাঘরা, বিপরীত দিকে গন্ডক এবং কিছু পূর্বে কোশী বামতীরে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অতঃপর বিহার হতে রাজমহল হতে ১০০ কিমি ভাটিতে দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম শাখা ভাগীরথী কালিনি এবং পরে হুগলী নামে কলকাতা দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। দ্বিতীয় শাখাটি গঙ্গা-পদ্মা নামে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানা ও বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার মোহনপুর থেকে অতিক্রম করে গোদাগাড়ী, রাজশাহী, চারঘাট, বাঘা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ইত্যাদি অতিক্রম পূর্বক রাজবাড়ি জেলার দৌলতদিয়ার নিকটবর্তী যমুনার (ব্রহ্মপুত্রের ধারা) সঙ্গে মিলিত হয় এবং মিলিত ধারা চাঁদপুরের নিকট মেঘনার সাথে মিলিত হবার পর মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।
গঙ্গা-পদ্মা নদীর গাঠনিক বৈশিষ্ট্যর মধ্যে দৈর্ঘ্য, আয়তন, প্রশস্ততা, গভীরতা ইত্যাদি পরিগণিত। উৎস হতে বাংলাদেশের মোহনা পর্যন্ত পদ্মানদীর মোট দূরত্ব ২৬০০ কিমি, প্রবেশ স্থল থেকে দৌলতদিয়া পর্যন্ত প্রায় ২২৯ কিমি এবং মেঘনার সঙ্গে মিলিত হবার স্থান পর্যন্ত ১৪৬ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। গঙ্গা-পদ্মা নদীর প্রশস্ততার পরিসীমা ১.৬ কিমি থেকে ৮ কিমি এবং নদীটি কখনও বিনুনী ও কখনও সর্পিল প্রকৃতির।
ভারত, নেপাল, চীন ও বাংলাদেশ নিয়ে এর অববাহিকা অঞ্চল যার মোট আয়তন প্রায় ১০৯৩২০০ বর্গকিলোমিটার (সারণী-২.২.১)।

সারণী ২.২.১ গঙ্গা-পদ্মা অববাহিকার স্থানিক বিন্যাসঃ

দেশ	মোট আয়তন বর্গকিমি	শতকরা হার
নেপাল	১৪৭৪৮০	১৩.৫৬
ভারত	৮৬০০০০	৭৯.০৯
চীন	৩৩৫২০	৩.০৮
বাংলাদেশ	৪৯২০০	৪.২৭
মোট	১০৯৩২০০	১০০.০০

উৎসঃ আমজাদ হোসেন খান, ১৯৯৪

রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, খুলনার উত্তরাংশ নিয়ে বাংলাদেশের গঙ্গা অববাহিকা গঠিত যার মিলিত আয়তন প্রায় ৪৯২০০ বর্গকিলোমিটার।

চিত্র ২.২.১

১৯৮০ সালের ভুউপগ্রহ মানচিত্র হতে দেখা যায় যে, উজানে নদীখাতের গড় প্রশস্ততা ৫.১৭ কিমি, ভাটিতে ৭.৪৮১ কিমি, বাকের চরের সংখ্যা ৫ টি, নদীগর্ভে চরের সংখ্যা ১৯ টি বাঁকের সংখ্যা ৯ টি এবং বক্রতার সূচক ১.৩২ ছিল। নিম্নদিকে বক্রতার সূচক হ্রাস পেয়েছে। অতএব নদীখাতের ধরন তীর ক্ষয়ের ধরন ও সঞ্চয়ের ধরন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে পদ্মানদী নদীখাত নকসার ধরন প্রসারতা বা Reach type হতে চলেছে।

পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলীঃ পানি নির্গমন, পানিতল, বন্যা ঘটন সংখ্যা, পলল নির্গমন মাত্রা, বিপদসীমা, বন্যা স্থায়িত্বকাল ইত্যাদি পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। যেমন-

পানি নির্গমন ও পানিতলঃ গঙ্গা-পদ্মা পুরাতন নদী হলেও পানি নির্গমন ও পানিতল রেকর্ড অতি সাম্প্রতিক কালের। ১৮১০ সাল হতে পানিতল ও ১৯৩৪ সাল হতে পানি নির্গমন তথ্য পাওয়া যায়। পদ্মানদী দিয়ে সর্বোচ্চ প্রায় ২৫ মিলিয়ন কিউসেক পানি নির্গমন হয়ে থাকে এবং সর্বনিম্ন ৪২০০০ কিউসেক। তবে ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাধ নির্মাণ ও পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের কারণে গড় বার্ষিক নির্গমন ৪১২০০০ কিউসেক। সর্বোচ্চ ২৬ মিলিয়ন কিউসেক, সর্বনিম্ন ৪২০০০ কিউসেক ও বর্ষাকালে ৭৫০০০ ঘন মিটার এবং শুষ্ক মৌসুমে মাত্র ১৫০০০ ঘনমিটার পানি নির্গমন হয়ে থাকে। অপরদিকে সর্বোচ্চ পানিতলের পরিমাণ ৪৮ ফুট এবং সর্বনিম্ন ১৮.৯ ফুট।

গঙ্গা-পদ্মা নদী দ্বারা প্রতি বছর প্রায় ১৬০০ মিলিয়ন টন ভাসমান বোঝা পরিবাহিত হয়ে থাকে। এ নদীতে সাধারণতঃ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বন্যা হয়ে থাকে।

গঙ্গার শাখানদী ও উপনদীসমূহঃ

পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে নিম্ন গঙ্গার উল্লেখযোগ্য শাখা নদীগুলো হচ্ছে, ভাগীরথী, হুগলী, মাথাভাঙ্গা, ইছামতি, ভৈরব, কুমার, কপোতাক্ষ, চিত্রা, নবগঙ্গা, গড়াই, মধুমতি এবং আড়িয়াল খা অন্যতম। এগুলোর মধ্যে গড়াই-মধুমতির পশ্চিমস্থ নদীগুলো পূর্বতন গতিপথ হারিয়ে অতিমাত্রায় রুদ্ধ অবস্থায় পরিণত হয়ে পড়েছে। যে অঞ্চল দিয়ে এই নদীগুলো প্রবাহিত সে অঞ্চলটিকে মৃতপ্রায় বদ্বীপ বলা হয়। গড়াই মধুমতি পূর্বদিকের নদীগুলো এখনও সক্রিয় এবং এ অঞ্চলে বদ্বীপ গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

গঙ্গা-পদ্মা নদী ও ফারাক্কা বাঁধঃ

গঙ্গা নদী এর অববাহিক অঞ্চলের প্রাণ। এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, কৃষি, বসতি, পরিবহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু সাম্প্রতিক বছর গুলোতে নদীর কার্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের অভাবনীয় কষ্টের কারণ হয়ে দাড়ায়। এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্ত হতে ১৬ কিমি দুরে ভারতের অভ্যন্তরে ১৯৭৫ সালে নির্মাণ করা ফারাক্কা বাঁধ। এই বাঁধের দ্বারা ভারত ইচ্ছামত পানি নিয়ন্ত্রণ করছে। নিম্নে ফারাক্কা বাঁধ কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যা গুলো তুলে ধরা হলোঃ

১) শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানি ধরে রেখে ভারত তাদের ইচ্ছামত সেচ কাজে ব্যবহার করছে। কিন্তু বাংলাদেশ অংশে পানির অভাবে কৃষি ব্যাহত হচ্ছে, ভূগর্ভস্থ পানি স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সেই সাথে অনেকের মতে আর্সেনিক সমস্যাকে পানি স্তর নীচে নেমে যাওয়ার জন্য দায়ী করা হয়।

২) শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় নদী বক্ষে চর পড়ছে বেশি মাত্রায়।

৩) পানির প্রবাহ কমে গেলে জোয়ার ভাটার পানির চাপ এসে পদ্মার নিম্নপ্রবাহ এলাকায় পৌছায়। ফলে এই মিঠা পানি প্রবাহিত নদী অঞ্চলে লোনা পানির অনুপ্রবেশ কৃষি ভূমির উর্বরতা হ্রাস করছে।

৪) বর্ষা মৌসুমে ভারত অতিরিক্ত পানি ফারাক্কার মাধ্যমে ছেড়ে দেয়। ফলে হঠাৎ করে আসা পানি বাংলাদেশে পদ্মা অববাহিকা অঞ্চলে আকষ্মিক বন্যার সৃষ্টি করে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে।

৫) নদী বক্ষে চর পড়া আর বর্ষা মৌসুমে হঠাৎ করে আসা প্রচুর পানির তোড়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নদী ভাঙ্গনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়াও ইহা আরও বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশ ফারাক্কার নির্মাণকাল হতে বর্তমান পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমেও এর সমস্যার সমাধান হয়নি। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর দুই দেশের ন্যায্য পানির হিস্যা পাওয়া সম্ভব হয়নি। এর উপর ভারতের আন্তঃনদী পানি সংযোগ প্রকল্প যদি গৃহীত হয় তাহলে হয়ত আমাদের এই শস্য শ্যামল সবুজের নীড় বাংলাদেশ হয়ে যাবে ধূসর মরুভূমিতে যা বর্তমানে পরিবেশবাদিরা মনে করেন।

পাঠসংক্ষেপঃ

গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা পৃথিবীর বৃহৎ নদীপ্রণালীর মধ্যে অন্যতম এবং এ নদী ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা বাংলাদেশের ভূমি, বসতি, কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও যাতায়াত ব্যবস্থা অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে অবদান রাখছে। এক কথায় এ নদী ব্যবস্থা বাংলাদেশের জনগণের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই পাঠটি পড়ে গঙ্গা-পদ্মা নদীর উৎপত্তি ও প্রবাহপথ; গঙ্গা-পদ্মা নদীর গাঠনিক বৈশিষ্ট্যাবলী; গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী; গঙ্গা-পদ্মা নদীর শাখা নদী ও উপনদী সমূহ; এবং গঙ্গা-পদ্মা নদী ও ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. **সঠিক উত্তরের পার্শ্বে ‘স’ এবং মিথ্যা উত্তরের পার্শ্বে ‘মি’ লিখুনঃ**

১.১. গঙ্গা নদী ব্যবস্থা বাংলাদেশের জনগণের জন্য জীবন ও মরণ।
১.২. গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ থেকে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে।
১.৩. গঙ্গা-পদ্মা পুরাতন নদী হলেও পানি নির্গমন ও পানিতল রেকর্ড অতি সাম্প্রতিক কালের।
১.৪. গঙ্গা-পদ্মা নদী দ্বারা প্রতি বছর প্রায় ১৬০০ মিলিয়ন টন ভাসমান বোঝা পরিবাহিত হয়ে থাকে।
১.৫. নদী বক্ষে চর পড়া আর বর্ষা মৌসুমে হঠাৎ করে আসা প্রচুর পানির তোড়ের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নদী ভাঙনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. **শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ**

২.১. গঙ্গোত্রী হিমবাহের .... থেকে আগত ...., ... ও পশ্চিম দিক থেকে আগত .... সংগমস্থল .... এর দক্ষিণ থেকে মিলিত ধারা .... নামে পরিচিত।
২.২. পাটনার কিছু পূর্বে ...., বিপরীত দিকে .... এবং কিছু পূর্বে .... বামতীরে .... সাথে মিলিত হয়েছে।
২.৩. প্রথম শাখা .... এবং পরে .... নামে কোলকাতা দিয়ে .... পতিত হয়েছে।
২.৪. পদ্মানদী দিয়ে .... প্রায় ২৫ মিলিয়ন কিউসেক .... নির্গমণ হয়ে থাকে এবং সর্বনিম্ন .... কিউসেক।
২.৫. এ অঞ্চলের মানুষের ...., কৃষি, ..., প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম।
২.৬. বর্ষা মৌসুমে ভারত .... ফারাক্কার মাধ্যমে .... দেয়।

সংক্ষেপে উত্তর লিখুনঃ

১. পদ্মা নদীর প্রবাহপথ ও উৎপত্তি আলোচনা করুন।
২. পদ্মানদীর গাঠনিক বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করুন।
৩. পদ্মা বা গঙ্গা নদীর পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন
৪. পদ্মা নদীর শাখা ও উপনদীসমূহ আলোচনা করুন।
৫. পদ্মা নদী ও ফারাক্কা বাঁধঃ ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. গঙ্গা-পদ্মানদী ব্যবস্থা আলোচনা করুন।
২. গঙ্গা-পদ্মানদীর পানিতাত্ত্বিক ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

পাঠ-২.৩

ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা

এই পাঠ পড়ে আপনি-
- ◆ উৎপত্তি;
- ◆ নদীর দৈর্ঘ্য প্রশস্ততা ও গভীরতা;
- ◆ অববাহিকার আয়তন;
- ◆ ঢাল ও নদীমাত্রা; এবং
- ◆ বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

ভূপৃষ্ঠের নিয়ত পরিবর্তন সাধনকারী নিয়ামকসমূহের মধ্যে নদী অন্যতম এবং নদী মাতৃক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যমুনা-ব্রহ্মপুত্র নদী ব্যবস্থা ও তার অববাহিকা এলাকার বিভিন্ন স্থানে ক্ষয়, বহন ও সঞ্চয় ক্রিয়ার মাধ্যমে বিচিত্র ভূমিরূপ সৃষ্টি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

যমুনা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী এবং বিশ্বের প্রধান নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা তিব্বত, ভারত ও বাংলাদেশ দিয়ে প্রবাহিত। যমুনা ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন প্রবাহ যা ১৭৯৭ সালের ভূমিকম্প ও বন্যার দ্বারা সৃষ্ট। নদীটি ৩১°৬০´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮২°.০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে হিমালয়ের মানস সরোবর ও কৈলাশ শৃঙ্গের মধ্যবর্তী চেমাইয়াংডং নামক হিমবাহ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। উৎপত্তিস্থল হতে চারবার নাম পরির্তন করে প্রবাহিত। ইহা তিব্বতে শানপো, আসামে ডিং ও ব্রহ্মপুত্র এবং বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা নামে পরিচিত।

যমুনা নদী উৎপত্তি স্থল থেকে শানপো নামে হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং সাদিয়া নামক স্থানে হিমালয়ের একটি বাঁক দিয়ে নেমে পড়ে। তারপরে আসামে প্রবেশ করে লোহিত নাম ধারণ করে। আসাম উপনত্যাকায় এই নদী ডিহং ও পরে ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত হয়ে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। অতঃপর গারো পাহাড়ের নিকট দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার নারায়নপর হউনিয়নের মাঝিয়াল নামক স্থান দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। নদীটি কিছুদূর প্রবাহিত হওয়ার পর বাহাদুরাবাদ ঘাটের নিকট দুইটি ধারা প্রবাহিত হয় যার একটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করেছে এবং অপরটি ঝিনাই নামক ক্ষুদ্র স্রোতধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে মিলিত ধারা যমুনা নামে (বর্তমান স্রোতধারা) দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় এবং সিরাজগঞ্জ ও আরিচা ঘাট অতিক্রম করে গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে।

নদীর দৈর্ঘ্য, প্রশস্ততা ও গভীরতাঃ উৎপত্তি স্থল হতে পদ্মার সাথে মিলনস্থল পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭০০ কিলোমিটার। বাংলাদেশের ভিতরে যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র মিলে এর দৈর্ঘ্য ২৭৬ কিমি। এর মধ্যে যমুনার দৈর্ঘ্য ২০৫ কিলোমিটার।

যমুনা নদীর প্রশস্ততা ৩ কিমি হতে ১৮ কিমি পর্যন্ত তবে এর গড় প্রশস্ততা প্রায় ১০ কিমি। বর্ষা ঋতুতে এর প্রশস্ততা সচরাচর ৫ কিমি এর অধিক হয়ে থাকে। নদীটির গড় গভীরতা প্রায় ১৮ মিটার। তবে অবস্থান ভেদে কম বা বেশি হয়। বাহাদুরাবাদে নদীটির গড় গভীরতা ১৩.২৯-২০.৬২ মিটার এবং সিরাজগঞ্জের নিকট গড় গভীরতা ৭.০৩-১৫.১২ মিটার। প্রশস্ততা ও গভীরতা অনুপাত ৫০ঃ১ থেকে ৫০০ঃ১ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

অববাহিকা এলাকার আয়তনঃ ব্রহ্মপুত্র-যমুনা অববাহিকার আয়তন প্রায় ৫৮৩০০০ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে তিব্বতে ২৯৩০০০ বর্গকিলোমিটার, ভারতে ২৪১০০০ বর্গকিলোমিটার এবং বাংলাদেশে কেবলমাত্রা ৪৭০০০ বর্গকিলোমিটার অবস্থিত। বাহাদুরাবাদের উজানে ব্রহ্মপুত্র ৫৩৬০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকার পানি নিষ্কাশন করে থাকে।

যমুনা নদীর ঢাল ও নতিমাত্রাঃ অন্যান্য সকল নদীর মত যমুনা নদীর ঢাল ভাটিতে ক্রমান্বয়ে কম এবং উজানে বেশি হয়ে থাকে। বাহাদুরাবাদ হতে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যমুনার নদীর ঢাল প্রতি মাইলে ০.৩৫ ফুট বা প্রতি কিলোমিটারে ০.৬ সেমি। বাংলাদেশে নদীটির নতিমাত্রা ০.০০০০৭৭ যা গঙ্গার সাথে মিলন স্থলের নিকটে ০.০০০০৫ এ হ্রাস পায়। যমুনার গড় নতিমাত্রা ১.১১৮৫০ এবং ইহা গঙ্গার তুলনায় সামান্য বেশি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যমুনা-ব্রহ্মপুত্র নদী ব্যবস্থা বড় বৈচিত্র্যময় এবং এর অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিম্নলিখিত দিকগুলো উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ২.৩.১

ভাঙ্গন প্রবণ যমুনা নদীঃ যমুনা একটি ভাঙ্গন প্রবন নদী, বিধায় এর তটরেখা সর্বদা পরিবর্তনশীল। গত ১৬০ বছরে নদীটির কোন না কোন স্থানে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই ভাঙ্গনের মাত্রা অনেক বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পশ্চিম পাড়ের গড় ভাঙ্গনও গড়ার হার বিগত দেড়শত বছরের চেয়ে যথাক্রমে ৯.৭ গুন -১০.২ গুন বেশি। ১৯৮১ হতে ১৯৯৩ সালের মধ্যে নদী ভাঙ্গনের ফলে সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় ৭২৯০০০ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ছিল যমুনা নদীর তীর ভাঙ্গনের শিকার।

চর বিশিষ্ট নদী যমুনাঃ যমুনা নদীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি বিনুনী সদৃশ নদী। নদীর তীর ভাঙ্গনে ও পলি বহনের মাধ্যমে ও তলদেশে জমার ফলে নদীর মধ্যে চরের সৃষ্টি করে। এসব চরের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অস্থায়ী এবং বর্ষা ঋতুতে প্লাবিত হয়ে এর ভূপ্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। যেখানে উপনদীগুলো মূল নদীর সাথে মিলিত হয় সেখানে দ্বীপ চর সৃষ্টি হয় এবং যেখানে নদীর স্রোত এক তীর হতে সরে সরাসরি অন্য তীরে যায় সেখানে বালুচর সৃষ্টি করে। যমুনা নদীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল চর একত্রীকরণের ফলে চরের দৈর্ঘ্য অনেক সময় ৩.০ বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত হয়। ল্যান্ডসেট ইমেজ হতে দেখা যায় ১৯৯২ সালের শুষ্ক ঋতুতে যমুনা নদীতে ৫৬ টি বড় আকারের চর বিদ্যমান যেগুলোর দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ৩.৫ কিলোমিটার এবং ২২৬ টি ছোট আকারের চর বিদ্যমান যাদের দৈর্ঘ্য ০.৩৫-৩.৫ কিমি।

যমুনা নদীর শাখা নদী ও উপনদীসমূহঃ যমুনা নদীর অনেকগুলো শাখা নদী বিদ্যমান। এর মধ্যে লোহিত, বুড়ি, নোওয়া, তোলী, দিহাং, মালায়, ধানসিড়ি, মানস, কামাক্ষা, কোপিলি, সুবোনসিড়ি, দিহিস্তা ইত্যাদি প্রধান। যমুনা নদী দীর্ঘ পথ অতিক্রমের সময় অসংখ্য উপনদী এসে এর সাথে মিলিত হয়েছে। এর মধ্যে দুধকুমার, ধরলা, তিস্তা এবং করতোয়া, আত্রাই নদী প্রণালী অন্যতম।

যমুনা নদীর গতিপথের ধরনঃ প্রত্যেক নদীকে তার গতিপথের উপর ভিত্তি করে তিনটি প্রধান ভাগ করা যায়। যথাঃ ক) পার্বত্য এলাকার প্রবাহ বা প্রাথমিক গতি, খ) উপত্যকা এলাকার নদীর মধ্যগতি ও গ) সমতল এলাকার নদীর নিম্নগতি। সংগত কারণেই যমুনা- ব্রহ্মপুত্র নদীকে তিন ভাগ করা যায়। নদীর উৎপত্তিস্থল থেকে আসাম পর্যন্ত উচ্চ গতি বা পার্বত্য প্রবাহ, আসাম উপত্যকা থেকে মাসহারী পর্যন্ত নদীর মধ্যগতি এবং মাঝহারী থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত নিম্ন গতি বা সমতলভূমি অবস্থা।

যমুনা নদীর পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ যমুনা নদী অববাহিকায় প্রতি বছরই বন্যা দেখা দেয়, কেননা যমুনা নদী অববাহিকায় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এখানে আসামের চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। তাছাড়া হিমালয়ের বরফগলা পানি ও মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ফলে জুলাই হতে সেপ্টেম্বর মাসে মধ্য ও নিম্নাঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এখানে মৌসুমের শুরু হতে মৌসুমের মাঝে এবং শেষদিকে বন্যা হতে দেখা যায়।

যমুনা জোয়ারভাটা মুক্তঃ যমুনা নদীর আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই নদীতে জোয়ার ভাটা হয় না।

যমুনা নদীর পানি সমতল ও পানি নির্গমনঃ যমুনা নদীর চিলমারী, আকুলিয়া, কামারখালী, ফুলবাড়ি, বাহাদুরাবাদ, ভাগ্যনাথ, আরিচা, সিরাজগঞ্জ ও নগরবাড়ি ইত্যাদি স্থানে স্টেশন বসিয়ে পানি সমতল ও পানি নির্গমন উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। ১৯৮৮ সালে নুসাকোয়া স্টেশনের সর্বোচ্চ পানি সমতল ছিল ২৮.৯ মিটার এবং সর্বনিম্ন পানি সমতল ছিল ২০.৯ মিটার।

যমুনা নদীতে পানি নির্গমন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এই নদীতে বার্ষিক গড় পানি নির্গমন ৪০০০০ কিউমেক। বর্ষাকালে নির্গমন বেশি হয়ে থাকে। সর্বোচ্চ পানি নির্গমন ছিল ১৯৮৮ সালে যার পরিমাণ ছিল ৯৮০০০ কিউমেক। বার্ষিক গড় প্রবাহ বাহাদুরাবাদের নিকট ৫১ মিলিয়ন একর ফুট।

তলানী বোঝা পরিবহণ ও সঞ্চয়নঃ যমুনা নদী প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ কোয়াটারনারী যুগে সৃষ্ট চুনবিহীন গাঢ় ধুসর বা বাদামী বর্নের প্লাবন সমভূমি দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কাদা, বালি, পলল কণা এবং সুক্ষ্ম কণার পরিমাণ বেশি। যমুনা নদীর মাধ্যমে বাহিত বোঝার আকার ০.১ মিমি হতে ০.২৮ মিমি। বর্ষা ঋতুতে যমুনা নদী দিয়ে দৈনিক প্রায় ১২ লক্ষ টন পলি বহন করে থাকে এবং বাহাদুরাবাদে পরিমাণকৃত যমুনার বার্ষিক পলিবহন ক্ষমতা প্রায় ৭৩৫ মিলিয়ন টন।

বিপদসীমাঃ এ নদীতে কিছু পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিপদসীমা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। নিম্নে যমুনা নদীর কিছু স্টেশনের বিপদসীমা দেখানো হলোঃ

সারণী ২.৩.১ : বিভিন্ন স্টেশনে যমুনা নদীর বিপদসীমা

স্টেশনের নাম	বিপদসীমা (মিটার)
চিলমারী	২৩.৩২
বাহাদুরাবাদ	১৯.৩৫
সিরাজগঞ্জ	১৮.৫৬
আরিচা	১১.০

গোয়ালন্দ	১০.০

উৎসঃ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

১৯৮৮ সালের বন্যার তথ্য হতে দেখা যায় বাহাদুরাবাদে সর্বোচ্চ পানি সমতল ছিল ২০.৭২ মিটার। যা বিপদ সীমার ১.৩৭ মিটার উপরে প্রায় ১০ দিন থেকেছে। এভাবে দেখা যায় প্রায় প্রতি বছরই পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

বন্যাঃ যমুনা নদীতে সারা বছরের পানি ছকের লাইন গ্রাফ আঁকলে দেখা যায় যে মধ্য জুলাই, মধ্য আগষ্ট এবং মধ্য অক্টোবরের পর থেকে তিনটি পিক পয়েন্ট বিদ্যমান। অর্থাৎ এই নদীতে বছরে তিনবার বন্যা হয়ে থাকে। পানি নির্গমনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে এবং ডিসেম্বরে ও জানুয়ারী মাসে নির্গমনের পরিমাণ সর্বনিম্ন হয়। সাধারণত পদ্মা ও যমুনা নদী দিয়ে একই সময়ে বন্যা হয় না। তবে ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালে এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে।

পাঠসংক্ষেপঃ

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে যমুনা নদী একটি বেনুনী সদৃশ নদী যার প্রশস্ততা বেশি। গভীরতা তুলনামূলকভাবে কম। এই নদীতে বন্যা বেশি হয়ে থাকে। চরের পরিমাণ বেশি, এ নদীর ভাঙন প্রবণতা বেশি বিধায় বাংলাদেশে অনেকটা হুমকীর সম্মুখীন। এই নদী অনেক সম্পদ নষ্ট করছে। তাই এর অব্যাহত ক্ষয় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে দরকার সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনাসহ সুনিপূণ নদী প্রশিক্ষণ কর্মসুচীর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. **শূন্যস্থান পুরণ করুনঃ**

১.১. ব্রহ্মপুত্র নদী তিব্বতে ...., আসামে .... ও .... এবং বাংলাদেশে .... নামে পরিচিত।
১.২. গারো পাহাড়ের নিকট দক্ষিণ দিকে বাঁকা .... জেলার নাগেশ্বরী থানার .... ইউনিয়নের .... নামক স্থান দিয়ে .... প্রবেশ করেছে।
১.৩. উৎপত্তি স্থল হতে পদ্মার সাথে.... স্থল পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য প্রায় .... কিলোমিটার।
১.৪. যমুনা নদী .... পথ অতিক্রমের সময় অসংখ্য .... এসে এর সাথে .... হয়েছে।
১.৫. যমুনা নদীতে কাদা ...., পলল কণা এবং .... পরিমাণ বেশি।

২. **সঠিক উত্তরের পার্শ্বে ‘স’ এবং অঠিক উত্তরের পার্শ্বে ‘মি’ লিখুনঃ**

২.১. যমুনা নদী গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে।
২.২. অন্যান্য সকল নদীর মত যমুনা নদীর ঢাল ভাটিতে ক্রমান্বয়ে কম এবং উজানে বেশি হয়ে থাকে।
২.৩. যমুনা একটি ভাঙ্গন প্রবণ নদী।
২.৪. যমুনা একটি বিনুনী সদৃশ নদী।
২.৫. যমুনা নদী অববাহিকায় প্রতিবছরই বন্যা দেখা দেয়।
২.৬. যমুনা নদীতে জোয়ার ভাটা হয় না।
২.৭. যমুনা নদীতে চরের সংখ্যা বেশি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর দৈর্ঘ্য, প্রশস্ততা, গভীরতা ও অববাহিকার আয়তন আলোচনা করুন।
২. যমুনা নদীর ঢাল, নতিমাত্রা, শাখা ও উপনদীসমূহ আলোচনা করুন।
৩. যমুনা নদীর পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা আলোচনা করুন।
২. ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

পাঠ-২.৪

মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থা

এই পাঠ পড়ে আপনি-
- মেঘনা নদীর উৎপত্তি;
- নদীর নামকরণ;
- শ্রেণীবিভাগ ও বিবরণ;
- শাখানদীসমূহ;
- নদীর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ;
- পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী;
- অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলী; এবং
- নদী ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক ইস্যু সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবেন।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদী ব্যবস্থার মধ্যে মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থা অন্যতম এবং দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি বৃহত্তম নদী ব্যবস্থা। পৃথিবীর বৃষ্টিবহুল চেরাপঞ্জির প্রায় কাছাকাছি স্থান এই নদী ব্যবস্থার উৎপত্তি স্থল এবং বাংলাদেশের প্রায় ৯০% পানি এই মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থা দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে।

মানুষের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক হিসাবে নদীর নাম উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর বড় বড় নদীগুলোর মধ্যে তিনটি বড় নদী বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীগুলোর মধ্যে মেঘনা একটি বৃহত্তম নদীমালা। তবে সব কয়টি বড় নদী এদেশে পরিণত অবস্থায় প্রবাহিত ফলে এদেশের সমভূমি গঠনে নদীগুলোর ভূমিকা সক্রিয়। নদীগুলোর প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং পরিণত অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থিত হওয়ায় নদীগুলো নিয়ে চলছে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। মেঘনা নদী বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী এবং পৃথিবীর বৃহৎ নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি হিমালয় বহির্ভূত একটি নদী ব্যবস্থা।

মেঘনা নদীর উৎপত্তিঃ মেঘনা মনিপুর রাজ্যের উত্তরদিকস্থ পর্বত থেকে উদ্ভূত হয়ে কিছুদুর পর্যন্ত নাগাপাহাড় ও মনিপুর রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা রচনা করেছে। তবে বলা যায়, প্রকৃত পক্ষে মেঘনা আসামের নাগামনিপুর পাহাড়ে উৎপন্ন জলবিভাজিকার দক্ষিণ ঢালে বিদ্যমান বরাক নদীর অংশবিশেষ। পরবর্তীতে এটি ভৈরববাজারের কাছে মারকুলি নামক স্থানে মেঘনা নাম ধারণ করে এবং পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়।

মেঘনা নদীর নামকরণঃ মেঘনা নদীর নামকরণ নিয়ে গল্প কথা প্রচলিত রয়েছে। এতে বলা হয়- আকাশে মেঘ দেখা দিলে মেঘনা উত্তাল হয়ে যায়। এ সময় নৌযান চলাচল নিরাপদ নয়। তাই মেঘনা এর নামের ব্যাখ্যা দাড়ায় মেঘ+না অর্থাৎ আকাশে মেঘ দেখা দিলে নাও ছাড়ো না। মেঘনা নামের এই কিংবদন্তী আজও মাঝি মাল্লাদের মনে সক্রিয়ভাবে জাগরুক রয়েছে (ওয়াজেদ)।

মেঘনা নদীঃ উৎসস্থল থেকে মোহনা পর্যন্ত মেঘনা নদীকে নিম্নোক্ত ২টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

প্রথম অংশ

পরবর্তী অংশ

নিম্নে এগুলোর আলোচনা করা হলোঃ

প্রথম অংশঃ প্রথম অংশ বলতে বোঝায় মেঘনা উৎপত্তি লাভের পর সামান্য পথ অতিক্রম করা পর্যন্ত। অর্থাৎ বরাক নদী ভারতের আসামরাজ্যের কাছাড় জেলার শিলচরের নিকট থেকে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে শ্রীহট্ট জেলার অমলশিদ নামক স্থানে দুটো ধারায় বিভক্ত হয়। এই ধারা দুটি নিম্নরূপঃ

ক) সুরমা

খ) কুশিয়ারা

ক) সুরমাঃ সুরমা পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে সিলেট শহরে প্রবেশ করে। এরপর উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে সুনামগঞ্জে আসে। এরপর দক্ষিণ-পশ্চিম হয়ে মদনার নিকট কুশিয়ারার সাথে মিলিত হয়। মেঘালয়ের মালভূমি থেকে উৎপন্ন অনেকগুলি নদী ও পানি প্রবাহ উত্তর দিক থেকে সুরমার সাথে মিলিত হয়। পূর্ব থেকে উত্তর দিকে এগুলো হলো- লুভা, হরি (কুশিয়া), গোয়াইন গাঙ্গ (চেঙ্গার খাল), পিয়াইন, বোগাপানি, যদুকাটা, সোমেশ্বরী এবং কংশ।

চিত্র ২.৪.১

মোহনগঞ্জের দক্ষিণে মগরার নিকট সুরমা দুইভাগে বিভক্ত হওয়ার পূর্বে কংশ নদীর পানিকে ধারণ করে। পশ্চিমের এই নদীটির উপরের অংশ ধানু, মাঝের অংশ বাউলি এবং নীচের অংশ ঘোড়াউতরা নামে পরিচিত। এই প্রবাহধারা কুলিয়ার চর পর্যন্ত এসে মিলিত হয়।

খ) কুশিয়ারাঃ বরাক নদীর দক্ষিণ অংশ কুশিয়ারা নামে পরিচিত। এটা উত্তরে মৌলভীবাজারের দক্ষিণে উলিবাজারে এসে ২ ভাগ হয়। বিভক্ত হওয়ার পূর্বে কুশিয়ারা নদী মনু নদীর পানিকে ধারণ করে। কুশিয়ারার বিভাগগুলি নিম্নরূপঃ

* উত্তরের অংশ বিবিয়ানা।
* দক্ষিণের অংশ বরাক।

বিবিয়ানা কিছুদুর চলার পর কালনী নাম ধারণ করে। আজমীরিগঞ্জের নিকট কালনী সুরমার সাথে মিলিত হয়।

কুশিয়ারার অপর অংশ বরাক নদী পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে আগত গোপলা এবং খোয়াই নদীর সাথে মিলিত হয় এবং এরপর মদনার নিকট সুরমায় পতিত হয়।

পরবর্তী অংশঃ সুরমা ও কুশিয়ারার দুই অংশ মিলিত হওয়ার পর আজমীরিগঞ্জের নিচে মেঘনা নাম ধারণ করে এবং পরবর্তীতে এই নদী হাওড় বেসিনে মিলিত হয়। এখানে পানি প্রবাহটি ২ ভাগে বিভক্ত হয়।

ক) আপার মেঘনা

খ) লোয়ার মেঘনা

ক) আপার মেঘনাঃ আপার মেঘনা কুলিয়ার চর থেকে ষাটনল পর্যন্ত অবস্থিত। এটি অপেক্ষাকৃত ছোট নদী।

খ) লোয়ার মেঘনাঃ এই নদীটি ষাটনল এর নিচ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি পৃথিবীর অন্যতম প্রশস্ততম নদী হিসাবে পরিচিত। লোয়ার মেঘনার সাথে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও গঙ্গার পানি এসে মিশেছে এবং এই প্রবাহ পরে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

মেঘনার শাখানদীঃ মেঘনার প্রধান প্রধান শাখা নদীগুলো নিম্নরূপঃ

পাগলী, উর্বমদি, কাঁঠালিয়া, ধনালিয়া, ধনাগদা, মতলব।

মেঘনা এবং উপরোক্ত শাখানদীগুলির সাথে ত্রিপুরার পার্বত্য এলাকা থেকে কিছু প্রবাহ এসে মিলিত হয়। এগুলো হলো- গোমতী, বালুঝুরি, হান্দাছড়া, হাওড়া, কুরিলিয়া, জঙ্গোলিয়া, সোনাইবুড়ি, সোনাইছড়ি, দুরদুরিয়া। এসব পাহাড়ী নদীগুলো মেঘনা নদীর কারণে যে আকষ্মিক বন্যা হয় সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মেঘনা নদীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থঃ বরাক-মেঘনার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০৪ কিমি। ভৈরববাজার ব্রীজের নিকট এর প্রশস্ততা .৭৫ কিমি। অপরদিকে ষাটনলের নিকট মেঘনার প্রশস্ততা ৫ কিমি। ষাটনল থেকে ১৬ কিমি দূরে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র যমুনা মেঘনার সাথে মিলিত হয় তখন এর প্রশস্ততা দাড়ায় ১১ কিমি (বর্ষাকালে)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মেঘনার দক্ষিণভাগ পৃথিবীর বৃহৎ নদীগুলির একটি।

সারনী ২.৪.১. সুরমা মেঘনা নদীর প্রকৃত দৈর্ঘ্য এবং অন্তর্ভূক্ত এলাকা (মাইল) নিম্নে (ছকের) মাধ্যমে উল্লেখ করা হলোঃ

মোট দৈর্ঘ্য		অন্তর্ভূক্ত এলাকা (মাইলে)
মাইল	কিমি	
৪১৬	৬৬৯	সিলেট- ১৮০ কুমিল্লা - ১৪৬ বরিশাল-৯০

উৎসঃ Statistical Yearbook, 2000.

এছাড়াও আপার মেঘনার দৈর্ঘ্য ৯৪৯.৩ কিমি এবং লোয়ার মেঘনার দৈর্ঘ্য ১৬০.৯ কিমি (হারুনুর রশিদ, জিওগ্রাফি অব বাংলাদেশ)।

মেঘনা নদীখাতঃ প্রাথমিক পর্যায়ে নদীখাত সংকীর্ণ ধরনের হলেও বার্ধক্য/পরিণত পর্যায়ে নদীখাত প্রশস্ত হয়। এক্ষেত্রে বলা যায়, মেঘনা নদীতে প্রশস্ত খাত দেখা যায়। এর প্রকৃত কারণ হলো উৎপত্তিস্থল থেকে উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন খাত অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হওয়া। অর্থাৎ মেঘনা নদী একটি পরিণত পর্যায়ের নদী।

মেঘনা নদীর পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী

পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বলতে সাধারণত পানির নির্গমন, পানি সমতল, লবণাক্ততা, বন্যা, অববাহিকার আয়তন ইত্যাদি বোঝায়। নিম্নে এগুলোর বর্ণনা করা হলোঃ

পানি নির্গমনঃ সুরমা নদীতে ১৯৫০ এবং ১৯৫৮ সালে পানির নির্গমন পরিমাপ করা হয় সর্বোচ্চ ৫৩০০৮ কিউসেক (১৫ আগষ্ট, ১৯৫৮) এবং সর্বনিম্ন ৪৮৭ কিউসেক (২১মার্চ ১৯৫৪)। অপরদিকে কুশিয়ারায় বর্ষাকালে ১৫০০০ কিউসেক পানি নির্গমন ঘটে। ভৈরববাজার ব্রীজের নিকট পানির নির্গমন পরিমাপ করা হয় প্রায় গড়ে ৭১০০ ঘনমিটার/সে (মে মাসের শেষ থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত)।

সারনী: ২.৪.২ : সিলেট স্টেশনে ১৯৯৫-১৯৯৬ সালে সুরমা নদীর পানি নির্গমনের কালিক বন্টন (ঘন মিটার/ সেকেন্ড)

মাস	নির্গমনের পরিমাণ
এপ্রিল	২.৮৫৫
মে	৬.৫৮৬
জুন	৯.৩৫২
জুলাই	১০.২৭৫
আগষ্ট	১০.৩৩৩
সেপ্টেম্বর	৯.২৩৫
অক্টোবর	৭.৪৮৫
নভেম্বর	৫.৬৯২
ডিসেম্বর	৩.৯৬৯
জানুয়ারী	২.৬৩৯
ফেব্রুয়ারী	২.২৫৭
মার্চ	৫.০৯০
বার্ষিক	৭৫.৭৬৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পানি বছর এপ্রিল-মার্চ)

এছাড়া লোয়ার মেঘনা প্রতি বছর গড়ে ৮৭৫ মিলিয়ন একর ফুট পানি নির্গমন করে এবং আপার মেঘনা ৯২ মিলিয়ন একর ফুট (MAF) পানি নির্গমন করে।

পানি সমতলঃ ১৯৯৯ -২০০০ সালে যে তথ্য পাওয়া যায় সে প্রেক্ষিতে বলা যায়, সেই বছর মেঘনা নদীর পানি সমতল এর পরিমাণ সর্বোচ্চ ছিল। তবে সর্বনিম্ন মানও সে নদীতে ছিল। অর্থাৎ বলা যায়, ১৯৯৯-২০০০ সালে ভৈরববাজার স্টেশনে মেঘনা নদীর পানি সমতল এর পরিমাণ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ছিল।

সারনী: ২.৪.৩ : মেঘনা ও সুরমা নদীর পানি তল এর পরিমাণ

নদী	স্টেশন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
মেঘনা	ভৈরববাজার	৪৯.৮০	০.০০
সুরমা	সিলেট	১১.২৫	২.২৫

উৎসঃ BWDB, Water year (April-March)

বন্যাঃ এই নদী ব্যবস্থায় বছরে ২ থেকে ৩ বার বন্যা হয়, যা সাধারণতঃ জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসসমূহে ঘটে থাকে। তবে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীতে মে মাস থেকে বন্যা হয় (সারণী)।

সারণী ২.৪.৪ : বন্যার সময় (দিন), বিপদসীমার পূর্বে ১৯৮৮

নদী	স্টেশন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	মোট
মেঘনা	ভৈরববাজার	২৫	১৩	২৫	৬৩
লয়ার মেঘনা	চাঁদপুর		২৬	১৯	৪৫

উৎসঃ Nizamuddin, K, (2001), Disaster in Bangladesh: Selected Readings.

প্রধান নদীর সাথে অনেক ছোট ছোট পাহাড়ী নদীর জলধারা এখানে মিলিত হয়। এ কারণে পাহাড়ী ঢল নামে এবং হঠাৎ বন্যা হয়। একে Flash Flood বলে। মধুপুর গড় ব্যতীত প্রায় সমগ্র মেঘনা উপত্যকা বর্ষার সময় সম্পূর্ণ প্লাবিত হয় এবং প্রতি বছর এ অঞ্চলের মৃত্তিকার একটি করে নতুন পলির আস্তরণ পড়ে।

পানির রাসায়নিক গুণাগুণ

সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থার পানির রাসায়নিক গুণাগুণ পর্যালোচনা করার জন্য ভৈরববাজার স্টেশনের পানিকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এখান থেকে পানির P^H, CO_2, CA, MG, CO_3, HCO_3, SO_4, -এর মান বের করা হয়। নিম্নে (ছকের) মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

সারনীঃ ২.৪.৫ : সুরমা-মেঘনা নদীর রাসায়নিক মান

নদীর নাম ও স্টেশন	P^H	CO_2	Ca	Mg	CO_3	HCO_3	SO_4	Cl	Salinity	TER
সুরমা-মেঘনা ভৈরববাজার মার্চ ১৯৮৩	9.91	2.94	11.00	8.21	2.35	43.63	37.73	6.95	42.54	280

উৎসঃ Technical Journal, River Research Institute (Faridpur), Vol. 02, No. 01, Jan. 1995.

সুরমা-মেঘনা নদীর উপরোক্ত সারণীতে প্রাপ্ত রাসায়নিক মান বিশেষত P^H মান দেখে বলা যায় এ নদীর পানিতে ক্ষারকত্ব বেশি। এছাড়া পানি স্বচ্ছ প্রকৃতির।

লবণাক্ততাঃ পদ্মার সাথে মিলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মেঘনা লবণাক্ত পানি বহন করে। নীলকমল, দৌলতখান, চাঁদপুর, ষাটনলে নদীর পানির লবণাক্ততা পরীক্ষা করা হয়। সুরমা-মেঘনা নদীর পানি ভৈরববাজারে যে লবণাক্ততার পরীক্ষা করা হয় তার মান ৪২.৫৪।

অববাহিকা আয়তনঃ মেঘনার অববাহিকা উপমহাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল অঞ্চল এবং প্রবাহ মূলত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। উৎস হতে মেঘনা অববাহিকার আয়তন ৬৪৭৫০ বর্গকিলোমিটার এর মধ্যে ২০৭২০ বর্গকিলোমিটার বাংলাদেশের অন্তর্গত।

সারনীঃ ২.৪.৬ : আপার মেঘনা এবং লোয়ার মেঘনার অববাহিকার আয়তন (মিলিয়ন একর)

নদী	অববাহিকার আয়তন (মিলিয়ন একর)
আপার মেঘনা	২০
লোয়ার মেঘনা	৪১৬

উৎসঃ হারুনুর রশিদ, Geography of Bangladesh.

উপরোক্ত দুটি নদীর অববাহিকার আয়তন লক্ষ্য করলে খুব সহজেই বোঝা যায় আপার মেঘনা অপেক্ষা লোয়ার মেঘনা নদী বড় এবং প্রশস্ততম নদী। নদী দুটি বাংলাদেশে অন্তর্গত। এবং এই নদী দুটির অববাহিকার আয়তন তাই নাগাপাহাড় থেকে পরিমাপ করা হয়নি। বরং বাংলাদেশের কুলিয়ারচর থেকে পরিমাপ করা হয়েছে।

এক নজরে সুরমা-মেঘনার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মেঘনা একটি বৃহৎ নদী। এ নদীর উদ্যোমে এখনও ভাটা পড়েনি। সুরমা-মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা-গঙ্গার মিলিত স্রোতধারা এ নদীর সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ।
- এ নদী বিপুল এলাকা দিয়ে প্রবাহিত। নদীটি ভাঙ্গন প্রবন।
- মেঘনার নীচের দিকে প্রচুর চর রয়েছে।
- মেঘনা অত্যন্ত গভীর ও নাব্য নদী, সারা বছর নৌ চলাচল করতে পারে।
- ধলেশ্বরীর সাথে মিলিত হওয়ার স্থানে দুই নদীর পানির রং এ সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এখানে মেঘনার পানি পরিস্কার নীলাভ সবুজ। আর ধলেশ্বরীর বাদামী (ওয়াজেদ)।
- মেঘনার তীরে প্রসিদ্ধ স্থানগুলি হলো- সিলেট, সুনামগঞ্জ, নরসিংদী, ভোলা, চাঁদপুর, বরিশাল প্রভৃতি।
- উল্লেখযোগ্য নৌ ও বাণিজ্যবন্দর হলো- ভৈরববাজার, কুলিয়ারচর, কালুপুর, পুরাতন চাঁদপুর, মারকুলী, আজমীরিগঞ্জ, মদনা, বৈদ্যের বাজার, রামদাসপুর।
- কুলিয়ারচর পৃথিবীর অন্যতম মৎস বাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা ও আশুগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এ নদীর তীরে অবস্থিত।

মেঘনা নদী ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক ইস্যু

মেঘনা একটি আন্তর্জাতিক নদী। এই নদীর উৎসস্থল ভারতে হওয়ায় এই নদী নিয়ে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে একটি তিক্ত সম্পর্ক বিদ্যমান। ভারত মেঘনার উজানে আসামের বরাক ও তুইভ়ী নদীর সঙ্গমস্থলে টিপাইমুখ জলাধার নির্মাণের প্রস্তাব দেয়। ড্যামটির উচ্চতা ১৬১ মি ও দীর্ঘ ৩৯০ মিটার যাতে ১৫.৯ হাজার মিলিয়ন ঘন মিটার পানি মজুদ রাখা যাবে। এই পানি দিয়ে ভারত সেচ নৌ চলাচল ও শুকনা মৌসুমে পানি প্রবাহ বাড়ানোর কাজ চালাবে।

ভারতের নদী সংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে বন্যা কমবে না বরং উল্টো হবে। বর্ষার সময় জলাধারে পানি আটকে দিলে বন্যার আশংকা কমবে না বাড়বে তা নির্ভর করবে সে বছরের বৃষ্টিপাতের উপর। বৃষ্টি বেশি হলে জলাধার চাপ সামলাতে পারবে না। তখন জলাধার বাচাতে বিপুল পরিমাণ পানি এক সঙ্গে ছেড়ে দেয়া হলে মুহুর্তের মধ্যে ব্যাপক এলাকা তলিয়ে যাবে।

এছাড়া ভূতত্ত্ববিদগনের মতে টিপাইমুখ বাধ এলাকা অত্যন্ত ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। এখানে বাধ দিয়ে তাই নদীর স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তন করা সমীচিন নয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এই এলাকায় ভূমিকম্প আঘাত হানবে এবং ধ্বংসলীলা চলবে যার অনুমাণ ভবিষ্যতই।

আন্তর্জাতিক ইস্যুর সমাধানঃ উপরোক্ত সমস্যাগুলো শুধুমাত্র মেঘনা নদী ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই নয় বরং তিস্তা, পদ্মা-যমুনার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। নদী ও দেশকে বাঁচানোর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ

- স্থিতিশীল সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সম্পর্কে কল্যাণমুখী একমত পোষণ করা।
- দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও নদী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময় পর পর সারা দেশের নদী ব্যবস্থা পর্যবেক্ষন করতে হবে।
- স্থানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে নদী ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটান।
- নদীতে ধ্বংসাত্মক অবকাঠামো নির্মাণ বন্ধ করার জন্য জনমত গড়ে তুলতে হবে এবং আন্তর্জাতিক ভাবে এর স্বীকৃতি আদায় করতে হবে।
- আমাদের দেশের নদীগুলি প্রতিনিয়ত গতিপথ পরিবর্তন করে এবং নতুন পলল গঠন করে। এই অবস্থার পরিবর্তন করা না গেলেও সঠিক ব্যবস্থাপনার দ্বারা পলল ভূমির ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।

পাঠসংক্ষেপ

একটি সীমান্তবর্তী নদী হিসাবে মেঘনা নদী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদী। এছাড়া এদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সবকিছুর সাথে এই নদী সম্পৃক্ত। তাই এই নদীর গুরুত্ব ও অবদান অনেক বেশি। এ কারণে এই নদী ব্যবস্থায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২:৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ**

১.১. মানুষের জীবনযাত্রার উপর .... বিস্তারকারী .... হিসেবে .... নাম উল্লেখযোগ্য।

১.২. নদীগুলোর প্রাথমিক, ... এবং পরিণত অবস্থা ...... দেশে অবস্থিত হওয়ায় .... নিয়ে চলছে .... চক্রান্ত।

১.৩. মেঘনা মনিপুর রাজ্যের উত্তর দিকস্থ.... থেকে .... হয়ে কিছুদুর পর্যন্ত .... ও .... রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা রচনা করছে।

১.৪. বরাক নদী ভারতের .... জেলার .... নিকট থেকে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে শ্রীহট্ট জেলার .... নামক স্থানে দুটো ধারায় বিভক্ত হয়।

১.৫. মেঘালয়ের .... থেকে উৎপন্ন অনেকগুলি .... ও .... উত্তর দিক থেকে .... সাথে মিলিত হয়।

১.৬. সুরমা ও .... দুই অংশ মিলিত হওয়ার পর .... নীচে .... নাম ধারণ করে এবং পরবর্তীতে এই .... বেসিনে মিলিত হয়।

১.৭. লোয়ার .... সাথে ব্রহ্মপুত্রঃ .... ও .... পানি এসে .... এবং এই প্রবাহ পরে .... পড়েছে।

১.৭. উত্তরঃ মেঘনার, যমুনা, গঙ্গার, মিশেছে, বঙ্গোপসাগরে।

১.৮. প্রধান .... সাথে অনেক ছোট ছোট .... নদীর .... এখানে মিলিত হয়।

১.৯. মেঘনার অববাহিকা .... মধ্যে সর্বাপেক্ষা .... এবং প্রবাহ মূলতঃ .... উপর নির্ভরশীল।

১.১০. আপার মেঘনা .... লোহার মেঘনা নদী .... এবং .... নদী।

১.১১. একটি .... নদী হিসেবে .... নদী অন্যতম .... নদী।

২. **সঠিক উত্তরের পার্শ্বে ‘স’ এবং মিথ্যা উত্তরের পার্শ্বে ‘মি’ লিখুন।**

২.১. মেঘনা হিমালয় বহির্ভূত একটি নদী ব্যবস্থা।

২.২. মেঘনা নদী একটি পরিণত পর্যায়ের নদী ব্যবস্থা।

২.৩. মেঘনা অত্যন্ত গভীর ও নাব্য নদী, সারা বছর নৌ চলাচল করতে পারে।

২.৪. মেঘনা একটি সীমান্তবর্তী নদী ব্যবস্থা।

২. ৫. মেঘনা একটি পাহাড়ীয়া নদী।

সংক্ষেপে উত্তর লিখুনঃ

১. মেঘনা নদী ব্যবস্থার উৎপত্তি, নামকরণ ও গতিপথ আলোচনা করুন।

২. মেঘনা নদী ব্যবস্থার শাখা নদীসমূহের একটি বিবরণ দিন।

৩. মেঘনা নদী ব্যবস্থার গঠনগত বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

৪. মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থার পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

৫. মেঘনা নদী ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক ইস্যু বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থা আলোচনা করুন।

২. মেঘনা নদীর গঠনগত ও পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

পাঠ-২.৫

বাংলাদেশে বন্যা

এই পাঠটি পড়ে আপনি-

- ◆ বন্যার সংজ্ঞা;
- ◆ বন্যার কারণসমূহ;
- ◆ বন্যার শ্রেণিবিভাগ ও তার বৈশিষ্ট্যাবলী;
- ◆ বন্যার উপকারিতা ও অপকারিতা; এবং
- ◆ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও তার উপায়সমূহ সম্পর্কে ধারনা লাভ করবেন।

বন্যা একটি ভয়াবহ দূর্যোগ যা বাংলাদেশে নিয়ত ঘটনা বলে পরিচিত। ইহা পরিবেশগত অবস্থাসহ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় রূপে চিহ্নিত। একদিকে যেমন ইহা যাতায়াত ব্যবস্থা, মৎস্যখাত ও মৃত্তিকার উর্বরতা ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তেমনি আবার ইহা মানুষের ক্ষেতের শস্যসহ জানমালের ব্যাপক ধ্বংসলীলায় তৎপর থাকে। বিগত ১০০ বছরে এদেশে প্রায় ৩০ বার বন্যা সংঘটিত হয়েছে তন্মধ্যে প্রলয়ংকারী ধরনের ১৭ টি, মহাপ্রলয়ংকারী প্রকৃতির ৫ টি এবং বাকী ৮ টি সাধারণ ধরনের বন্যা বলে চিহ্নিত হয়েছে (মহালনবীশ, পানি উন্নয়ন বোর্ড)।

হিমালয় দুহিতা নদীমাতৃক দেশ হিসেবে পরিচিত নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের দূর্যোগ বিশেষ করে বন্যা যা প্রতি বছরই দেশের কোন না কোন অঞ্চলে সংঘটিত হয়ে থাকে। ফলস্বরূপ এক দিকে যেমন সম্পত্তি, জানমাল, শস্য, ফল, রাস্তাঘাট, বসতি ইত্যাদির অপরিসীম ধ্বংস লীলা বয়ে আনে, আবার অন্যদিকে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি সহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক সুবিধার সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে।

প্রতিবছর আর্দ্র মৌসুমে দেশের প্রায় ২০% এলাকা স্বাভাবিক বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে এবং ১৯৮৮ সালের মহা বন্যায় দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ এলাকা বন্যার কবলে পড়ে (ভূঞা ও ইলাহী, ১৯৮৮)। অতিসম্প্রতি ২০০৪ সালে দেশের প্রায় ৭৫ ভাগ বন্যার কবলে পড়ে এবং ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

নদীর দুই তীর/দুকূল ছাপিয়ে উপচিয়ে যে পানি প্লাবন সমভূমিতে পতিত হয় এবং দ্রুত পার্শ্ববর্তী এলাকা তলিয়ে ফেলে, তাকেই বন্যা বলা হয়। অর্থাৎ নদীর ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি পানি ফসলের জমি, বসতি, ভিটা, রাস্তাঘাট ডুবিয়ে ফেলে এবং বিভিন্ন জিনিসের ব্যাপক ক্ষয় সাধন করে, তাকে বন্যা বলে। সমভূমি অঞ্চলে ও মোহনার কিছু উজানে প্রায়ই বন্যা লেগে থাকে। নদী বাহিত পলল অবক্ষেপনের কারণে নদীখাত ভরাট হয়ে গেলে ঋতু বিশেষে অকস্মাৎ উজান এলাকা হতে প্রচুর পানি নেমে আসলে স্বল্প গভীর নদীর খাত বা বক্ষ ধারণ করতে সক্ষম হয় না। ফলে নদীর উভয় তীর ছাপিয়ে প্রচুর পানি চতুস্পার্শের স্থানসমূহ প্লাবিত করে। বাংলাদেশের বড় বড় নদী এলাকায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হতে দেখা যায়।

বন্যার সংজ্ঞার ব্যাপারে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধারণার প্রতিফলন ঘটে থাকে। এখানে কয়েক জনের সংজ্ঞা প্রদান করা হলোঃ

স্ট্রলারের মতে, "কোন নদী নালা ও নিম্নভূমির জল ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত প্রবাহ দুকুল উপচে যদি পারিপার্শ্বিক ভূমি, বন, বসতি প্লাবিত করে তাহলে সার্বিকভাবে ঐ অবস্থাকে বন্যা বলা হয়।"

চাও এর মতে "বন্যা হলো ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত পানি প্রবাহ যা নদীখাত দিয়ে উপচিয়ে পার্শ্ববর্তী ভূমি বা জনপদকে প্লাবিত করে।"

ব্লুম বলেন, কোন একটি নদীর কতিপয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে নদীর জ্যামিতিক খাত অনুযায়ী অতিরিক্ত পানি নির্গমন যদি নদীখাতের উচ্চতা অতিক্রম পূর্বক উপচিয়ে প্রবাহের সৃষ্টি হয়ে বন্যা সংঘটিত হবে।

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে, কোন স্থান হঠাৎ বৃষ্টিপাত বা বরফগলা জনিত কারণে নদীতে পানি বৃদ্ধি বা অন্য কোন কারণে নদীর পানি আকস্মিকভাবে বেড়ে গিয়ে যখন নদীর উভয় কূল ছাপিয়ে পার্শ্বেবর্তী এলাকার উপর দিয়ে দ্রুত পানি প্রবাহিত হয়ে ফসলের জমি, বসতবাড়ি, অস্থাবর সম্পত্তি ও পশু পাখির আধার বিনস্টসহ ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে তখন তাকে বন্যা বলা হয়। বন্যা সাধারণতঃ প্লাবন সমভূমি অঞ্চলে বেশি হয়। আবার নদীর অববাহিকা বা উৎস অঞ্চলে বন্যা সংঘটিত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার কারণ হিসেবে সামগ্রিকভাবে জলবায়ু সংক্রান্ত ভূপ্রাকৃতিক, ভূতাত্ত্বিক, সামুদ্রিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি নিয়ামক চিহ্নিত হলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোন একটি নিয়ামককে এককভাবে দায়ী করা যায় না। সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন নিয়ামক এদেশের মানুষের সীমাহীন দুঃখের বিষয় বন্যার সৃষ্টির জন্য দায়ী। তবে আলোচনার সুবিধার্থে বন্যার কারণগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে আগ করা যায়। যেমন- ১) প্রাকৃতিক ও ২) অপ্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট কারণ।

১) প্রাকৃতিক কারণঃ এর মধ্যে জলবায়ুগত, ভূ-তাত্ত্বিকগত, সামুদ্রিক ইত্যাদি বুঝায়। যেমনঃ

ক) জলবায়ু সংক্রান্ত কারণসমূহ

ক.১) অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের পানিঃ হিমালয় পর্বত ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় মহাসাগরের দিক থেকে আগত গ্রীষ্মের মৌসুমী বায়ু এই সুউচ্চ ও সুদীর্ঘ পর্বত প্রাচীরে প্রতিহত করে। প্রচুর জলীয় বাস্প বহনকারী এই বায়ু হিমালয়ের পাদদেশে এবং বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। গঙ্গা-ব্রক্ষপুত্র, মেঘনা নদীর উপনদী গুলোর ধারণ অববাহিকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে এসব নদীখাতের প্রচুর পানি বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন নদী বন্যার সৃষ্টি করে।

ক.২) অতিরিক্ত বরফগলা পানিঃ গ্রীষ্মের অধিক উত্তাপে হিমালয় পর্বত অঞ্চলে প্রচুর বরফ গলতে শুরু করে। বিভিন্ন সুরঙ্গ পথে এই পানি নেমে বড় বড় নদীখাতে এই সরবরাহ করে। বর্ষা ঋতু আবির্ভাবের আগেই এই পানি বাংলাদেশের নদীগুলোর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়।

ক.৩) পুনঃপুনঃ নিম্নচাপ সৃষ্টিঃ ২১ মার্চ সূর্যের নিরক্ষরেখা অতিক্রমের পর উত্তর গোলার্ধে দ্রুত উষতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় বঙ্গোপসাগরে পুনঃপুনঃ নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় ফলে বঙ্গোপসাগরের উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়। তাই ক্রমান্বয়ে পানি বিভিন্ন খাড়ী পথে ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে বন্যার সৃষ্টি করে।

ক.৪) উত্তরমুখী বায়ুপ্রবাহঃ বাংলাদেশের প্রায় সব গুলো নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোসাগরে পানি সরবরাহ করে। গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হবার ফলে নদীর পানি যত তাড়াতাড়ি সমুদ্রে নেমে যাওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক কম হারে পানি নেমে যায়। কিন্তু নদীর পানি অধিক উত্তর দিক থেকে আসতে থাকায় বন্যার সৃষ্টি হয়।

ক.৫) স্বল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাতঃ ভারত, বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের ৮০% জুন থেকে অক্টোবর পাঁচ মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বাইরে ও দেশের অভ্যন্তরে স্বল্প সময় এ ধরনের বৃষ্টিপাত হওয়ায় এদেশের নদীগুলো গড়ে ৯৬ কোটি একর ফুট পানি প্রবহিত হয় (হোসেন ও অন্যান্য ১৯৮৭)। এই অতিরিক্ত প্রবাহ বাংলাদেশের নদীগুলো নিষ্কাশন করতে পারে না। ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়।

গ) ভূ-তাত্ত্বিক কারণাদি

গ.১) ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ঃ বাংলাদেশের নদীগুলোর পানি পলি মাটিতে সমৃদ্ধ। নরম মাটির উপর দিয়ে বয়ে আসা পানি সরন পয়োনালী ক্ষুদ্র স্রোতধারা প্রভৃতি প্রচুর পলি বয়ে এনে নদীর পানি ঘোলা করে তোলা যাতে বর্ষা ঋতুতে নদীগুলোর পানির পরিমাণ বেড়ে যায়। ক্রমাগত পলি সঞ্চয়নের ফলে নদীখাত অনেকাংশে ভরাট হয়ে যায়। পরিনামে বন্যা সংঘটিত হয়।

গ.২ মোহনায় বদ্বীপের সৃষ্টিঃ নদীর মোহনায় পলি জমে বদ্বীপের সৃষ্টি করে, তেমনি বিভিন্ন নদীর পলি সঞ্চিত হয়ে গঠিত বাংলাদেশে একটি বদ্বীপ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণে পলি সঞ্চিত হয়ে নতুন বদ্বীপ গড়ে তোলার ফলে উত্তর থেকে আগত বিরাট পানির চাপ এসে পড়ে যা এদেশের নদীগুলোতে যা এদেশের বন্যার অন্যতম কারণ।

গ.৩) নদীখাতে চরের সৃষ্টিঃ প্রতিনিয়ত পলি সঞ্চিত হতে হতে বড় বড় নদীখাতে ছোট বড় বহু ধরনের চরের সৃষ্টি হওয়ায় পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হয়। ফলে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত হতে পারে না এবং বন্যার সৃষ্টি হয়।

গ.৪) নদীগুলোর স্বল্প নতিমাত্রাঃ যে কোন অঞ্চলের সমভূমিতে নদীগুলোর ঢালের পরিমাণ কম হয়। বাংলাদেশে মৃদু ঢালবিশিষ্ট সমভূমির দেশ। এদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলো প্রতিবর্গ মাইলের ০.৬ ফুট ঢাল বিশিষ্ট। বর্ষায় নদীর অতিরিক্ত পানি দ্রুত সমুদ্রে নিষ্কাশিত হতে পারে না। এ জন্য নদী অববাহিকা অঞ্চলে সহজেই বন্যা দেখা যায়।

ভূ-আলোড়নঃ ভূ-আলোড়নের ফলে অনেক নদীর তলদেশের ক্রমোন্নতি হয়েছে। ১৯৫০ সালে ভূমিকম্পের সময় এরূপ ক্রমোন্নতি সাধিত হয়েছে যমুনাসহ বেশ কয়েকটি নদীর। ফলে নদীর নিষ্কাশন ক্ষমতা আরও হ্রাস পেয়েছে। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত না হওয়ায় দেশে বন্যার সৃষ্টি হয়।

ভূ-প্রাকৃতিক কারণ ঃ

প্রধান নদীগুলোতে একই সময়ে সর্বোচ্চ প্রবাহের সৃষ্টিঃ গ্রীষ্মের বরফ গলা পানির চাপ নদীগুলোতে কমার আগেই ভারত থেকে প্রচুর পানি বিভিন্ন নদীর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং একই সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে এ দেশের নদীগুলোতে পানির চাপ বেশি থাকে। সাধারণ গঙ্গার পানি যে সময়ে সর্বোচ্চ প্রবাহে পৌছায় তার কিছুদিন পর যমুনার পানি সর্বোচ্চ প্রবাহে পৌছায়। ফলে বন্যার প্রকোপ দেখা যায়।

নিম্ন সমভূমিঃ বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবে একটি নিম্নসমভূমি এলাকা। গড় সমুদ্র পৃষ্ঠের তুলনায় দেশের অর্ধেকের বেশি এলাকার উচ্চতা ২৫ ফুটের কম। ফলে যে বছর বেশি বৃষ্টিপাত হয় সে বছর অধিকাংশ নিচু এলাকা থেকে পানি অপসারিত হতে পারে না। ভূমিরূপ যথেষ্ট সমতল হওয়ায় এ পানি চারিদিকে ছড়িয়ে বন্যার সৃষ্টি করে।

ত্রুটিপূর্ণ নিষ্কাশন ব্যবস্থাঃ দেশের অধিকাংশ স্থানেই অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। অপরিকল্পিভাবে শহর নগর মহানগর বন্দর শিল্পাঞ্চল তৈরি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করার ফলে দেশের নিষ্কাশন ব্যবস্থার আরো অবনতি হয়েছে। বর্ষার পানি নেমে যাবার মতো পর্যাপ্ত খাল, শাখা নদী, পয়োনালী না থাকায় পানি এসে সাময়িক বন্যার সৃষ্টি করে।

নিম্নাঞ্চলে বহুল পরিমাণে ভরাটঃ নিম্নাঞ্চলে বহুল পরিমাণে ভরাট হওয়ায় মাদারীপুরের বিল, পাবনার চলনবিল, সিলেটের হাওড়গুলো বড় নদীর অতিরিক্ত পানি সংরক্ষণাগার হিসেবে কাজ করে। প্রাকৃতিক কারণে পলি সঞ্চিত হয়ে এসব নিচু এলাকা ভরাট হয়ে আসায় এসব নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে বর্ষার পানি বৃদ্ধিতে স্থানীয়ভাবে বন্যা দেখা দেয়।

সামুদ্রিক কারণ

১) জলোচ্ছাসঃ উপকূলবর্তী সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সামুদ্রিক জলোচ্ছাস বন্যার একটি অন্যতম কারণ। জোয়ারের সময় এরূপ জলোচ্ছাসের পানি ১২-১৫ ফুট পর্যন্ত উচ্চ হয়ে উপকূলে আঘাত করে। ফলে উপকূলে সামুদ্রিক বন্যা সৃষ্টি করে।

২. সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বৃদ্ধিঃ বহুকাল যাবৎ অবিরত পলি সঞ্চয়ের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশের গড় উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জোয়ারের পানি পূর্বের চেয়ে দেশের অনেক ভিতরে প্রবেশ করে নদীর পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা সাময়িক হ্রাস করে এবং বন্যার সৃষ্টি হয়।

সাংস্কৃতিক কারণসমূহ

১. নদীর গতিপথে অন্তরায় সৃষ্টিঃ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে গিয়ে দেশের বহু জায়গায় নদীর গতিপথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছে। সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ করার জন্য এসব অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে পানি নিষ্কাশিত হতে না পেরে বন্যার সৃষ্টি করে।

২. বাধ ও বেরি বাঁধ তৈরিঃ কৃষি ভূমিতে পানি সেচের প্রয়োজনে গতি পথে বাঁধ তৈরি করা হয়। গঙ্গা নদীর ভারতীয় অংশে ৩৪ টি বেশি বড় আকারের এবং ১৭০ টি মাঝারী আকারের প্রকল্প চালু রয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদের ভারতীয় অংশে অনুরূপ বহু বাধ নির্মাণ করা হয়েছে। যাহার উপর ফারাক্কা বাধ নির্মাণ শুষ্ক ঋতুতে পানি আটকে রেখে কৃষিক্ষেত্রে পানি সেচ করা হয় আবার বর্ষা মৌসুমে বাধের ফটক খুলে দেয়া হয়। ফলে অনেক সময় অনাকাঙ্খিত বন্যার উদ্ভব হয়ে থাকে।

৩. পানি সংরক্ষণাগারঃ পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের নামে বহুমুখী কৃত্রিম পানি সংরক্ষণাগার তৈরি বন্যা সৃষ্টির জন্য বহুলাংশে দায়ী। নদী ব্যবস্থার এসব নিয়ন্ত্রণ কর্মপন্থা নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধার সৃষ্টি করে।

৪. বন উৎপাটনঃ ভারত, নেপাল ও ভুটানের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র পার্বত্য এলাকার বহু বনভূমি, শিল্প, গৃহনির্মাণ, জ্বালানী ইত্যাদি কর্মকান্ডের নিমিত্তে পার্বত্য ভূমিতে ব্যাপক বন উৎপাটন শুরুকরণ অর্থাৎ বনভূমি পরিস্কার করে বসতি, চারণভূমি, কৃষিভূমি তৈরি করা হয়েছে। বন নিধন করার ফলে পানির নিচে নেমে যাওয়ার মত পর্যাপ্ত খাল শাখানদী প্রভৃতি না থাকায় পানি জমে বন্যার সৃষ্টি করে।

মানব সৃষ্ট কারণ

মানব সৃষ্ট কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

নদীর গতিপথে অন্তরায় সৃষ্টিঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ নদ-নদীগুলো উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি। আর আমাদের সড়ক ও রেলপথগুলো হলো পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি। তাই এই সড়ক ও রেলপথের জন্য নদ-নদীর পানি নিষ্কাশন বাধার সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে রেল ও সড়ক পথের উজান অংশে পানি ফুলে বন্যার সৃষ্টি করে।

বাঁধ ও ভেরি বাঁধ নির্মাণঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ নদ-নদীগুলো ভারত থেকে আগত আর ভারত এসকল নদ-নদীগুলোতে বাঁধ দিয়ে শুষ্ক মৌসুমে পানি আটকিয়ে দিচ্ছে ফলে খরা দেখা দিচ্ছে। আবার বর্ষার সময় পানি ছেড়ে দিচ্ছে ফলে ভূমি প্লাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশে এই বাঁধ নির্মাণও বন্যার অন্যতম কারণ। গঙ্গ-ব্রহ্মপুত্র এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চিত্র: ২.৫.১

জলাবদ্ধতা বা পানি সংরক্ষণাগার তৈরিঃ বাংলাদেশের অনেক স্থানে নিম্ন জলাশয় কিংবা নদীখাতে পানি আটকিয়ে পানি সংরক্ষণাগার তৈরি করে বন্যার সৃষ্টি করে। কারণ পানি সংরক্ষণাগার থাকায় পানি সঠিকভাবে প্রবাহিত হতে পারে না। ফলে বন্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

বৃক্ষকর্তনঃ হিমালয় ও পাহাড়ীয়া অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ কর্তন করে বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ ব্যাপকভাবে বৃক্ষ কর্তনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে নদীর দূকুল ভেঙ্গে বন্যার সৃষ্টি করছে। নদীর দুপাড় ভেঙ্গে বন্যা গঠনে সহায়তা করছে।

বন্যার প্রকৃতিঃ বন্যার প্রকৃতি বিভিন্নতা অনুসারে এদেশের বন্যাকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

১. আকস্মিক বন্যাঃ হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ী বৃষ্টিজনিত বন্যা প্রধানত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয়ে থাকে। এই পানি দ্রুত নেমে এসে বাংলাদেশের পূর্বাংশের ব্যাপক এলাকা প্লাবিত করে। অধিক গতিবেগ সম্পন্ন এলাকায় এ বন্যার স্থিতিকাল খুবই সংক্ষিপ্ত মাত্র ১-৩ দিনের মধ্যে। নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, কুমিল্লা জেলার ব্যাপক অঞ্চল, ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশ, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর প্রভৃতি স্থানে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়।

২. বৃষ্টিপাত জনিত বন্যাঃ জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের ৩-১০ দিনের স্থানীয় বৃষ্টিপাতের ফলে নিষ্কাশন স্বল্পতার জন্য স্থানীয়ভাবে এক প্রকার বন্যা হয়। বৃষ্টিপ্রবাহ বন্যার পানির প্রধান উৎস। ঝড় বৃষ্টির অবস্থার ভিত্তিতে বাংলাদেশের যে কোন নিম্নাঞ্চলে এ ধরনের বন্যা হতে পারে। তবে রাজশাহী অঞ্চলের যমুনার পশ্চিম পার্শ্বে সংকীর্ন এলাকা, পদ্মা নদীর উত্তরে সংকীর্ন এলাকা এবং বরেন্দ্রভূমির ও উত্তরের পাদদেশীয় অঞ্চল সমগ্র রাজশাহী বিভাগ ও খুলনা বিভাগের মৃতপ্রায় বদ্বীপ অঞ্চল ব্যতীত কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার পশ্চিমাংশ এ ধরনের বন্যা জনিত অঞ্চল।

৩. ঘূর্ণিবার্তা জনিত বন্যাঃ এপ্রিল থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসে স্বল্পকালীন স্থানীয় প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সাথে উপকূল এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে বন্যা হয়। ফলে সুন্দরবন অঞ্চল, পিরোজপুর, মাদারীপুর, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, বরিশাল ও ভোলা জেলার দক্ষিণাংশ এবং চট্টগ্রাম জেলার পশ্চিমাংশে ফসল ও জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়।

৪. প্রধান নদী দ্বারা প্লাবিত বন্যাঃ দেশের তিনটি নদী ব্যবস্থার বিভিন্ন উচ্চতা সম্পন্ন প্লাবনভূমি গুলোতে মধ্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থানীয় বর্ষাকালে নদীর ভিতর উভয় পাশে বন্যা হয়। বাংলাদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল বিশেষ করে পদ্মা যমুনা এবং এদের শাখাগুলোর উভয় পাশে এ বন্যা ফসল ও জনমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

বন্যার অপকারিতা

বিংশ শতাব্দীতে ২০ টিরও বেশি বন্যা হয়েছে। এগুলো যথাক্রমে ১৯০০, ১৯০২, ১৯০৭, ১৯১৮, ১৯২২, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭৪, ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০০ সালে বন্যা হয়েছে। এসব বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। ১৯৫৪ সালে দেশের প্রায় ২৭% এলাকা, ১৯৭৪ সালে ৩৪%, ১৯৮৮ সালে ৬৮%, ১৯৯৮ সালে ৭২%, ১৯৯৪ সালে ৬৮% এলাকা বন্যা কবলিত ছিল। বন্যা সাধারণত নিম্নলিখিত ক্ষতিসাধন করে থাকে।

১. বন্যায় বহু মানুষ আশ্রয়হীন হয় আর বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করে।
২. বন্যা কবলিত এলাকায় বিভিন্ন রোগব্যাধি দেখা দেয়।
৩. দেশের পশু সম্পদ ও হাঁসমুরগী প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়।
৪. মাঠের উঠতি ফসল ডুবে যায় ফলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য শস্য আমদানী করতে হয়।
৫. যাবতীয় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়।
৬. সড়ক পথ, রেল পথ, বিমান বন্দর ডুবে যাতায়াতের প্রচুর ক্ষতি হয়।
৭. সেতু কালভার্ট ধ্বংস হয়।
৮. শিল্প কারখানায় যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়।
৯. যোগাযোগ, যাতায়াত, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়।
১০. নদীখাতে ব্যাপক আকারে ভাঙ্গন শুরু হয়। ফলে বহু লোকের বসত ভিটা ও ফসলী জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।
১১. টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, যোগাযোগ, ডাক ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি হয়।
১২. শহর নগর অঞ্চলে, পয়োনালী ও গ্যাস লাইনের প্রচুর ক্ষতি হয়।
১৩. দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়।

১৪. বন্যার কারণে বহু মানুষ বাস্তভিটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।
১৫. বন্যার ফলে মানুষের পেশা বৃত্তির পরিবর্তন সাধিত হয়।
১৬. বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দেয়।
১৭. বিভিন্ন দূর্ঘটনায় বিশেষ করে সাপের কামড়ে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
১৮. বন্যা পীড়িত লোকজন, সরকার, বিভিন্ন এনজিও ও সমাজের সম্পদশালী লোকদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় সমাজের মাস্তানদের শিকারী হয়ে অসম্মানজনক কার্যকলাপে নিযুক্ত হতে দেখা দেয়।
১৯. দেশের রপ্তানী বাণিজ্যে মারাত্মক ব্যাহত হয়।
২০. দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।
২১. উন্নয়নে পর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়।
২২. ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

বন্যার উপকারিতা

১. বন্যার ফলে মাটিতে দস্তা ও তামাজাতীয় সারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
২. বন্যা বাহিত পানিতে কৃষি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
৩. বন্যার ফলে প্রচুর আবর্জনা ভেসে যায়। যার ফলে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হয়।
৪. মৎস্য সম্পদের বৃদ্ধি পায়।
৫. উন্নয়নের নূতন চিন্তা ধারণার উন্মেষ ঘটে।
৬. সুলভে পরিবহণের ব্যবস্থা হয়।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ

যেহেতু বন্যা এদেশে নিয়ত সঙ্গী এবং উপকারের চেয়ে অপকারিতা বেশি বিধায় একে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক যাতে বন্যার ভয়াবহতার মাত্রা হ্রাস পায়। বর্তমানে বাংলাদেশে বন্যাকে ৩টি উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, যেমনঃ ১) চিরাচরিত বা কাঠামোগত পদ্ধতি -এ পদ্ধতিতে নদী তীরবর্তী এলাকায় বা নদীর উপরে বাঁধ, লেভী স্লুইচং গেট ডাইক্যা, বন্যা প্রাচীর, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করে নদীর প্রবাহ হ্রাসকরণ তথা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ২) অকাঠামোগগত পদ্ধতি যাতে বৃহৎ আকারের ও ব্যয় বহুল নির্মাণ কাজের পরিবর্তে এ কাজে সকলকে অবহিত করণ ও সচেতন করে তোলায় বন্যার সঙ্গে বসবাস উপযোগী ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়ে থাকে আর (৩) বর্তমান পদ্ধতি যেটি উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে অর্থাৎ বন্যার সঙ্গে সহবস্থান প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও জনগণকে অন্যত্র স্থানান্তর করণ এবং প্রয়োজনে স্থায়ীভাবে কাঠামো নির্মাণ কর্ম কান্ডকে বুঝানো হয়ে থাকে। এতে সার্বিকভাবে বন্যার ভয়াবহতা ও ব্যাপক ধরনের ধ্বংসলীলার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। এর জন্য সুষ্ঠ নদী ও বন্যা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক।

বন্যা মোকাবেলায় প্রস্তুতি

১) বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের ব্যবস্থা আধুনিকরণ অতি বন্যা প্রবণ এলাকায় মাঠ উচু করে বাড়ি ঘর তৈরি করতে হবে। (২) বন্যা প্রবণ এলাকায় সড়ক ও গ্রামের রাস্তাগুলো যথেষ্ট উচু ও প্রশস্ত করে তৈরি করতে হবে। (৩) বন্যা উপদ্রুত এলাকায় বন্যা প্রতিরোধমূলক বড় দালান নির্মাণ করতে হবে। (৪) পর্যাপ্ত পাকা উচু আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। (৫) বন্যা প্রবণ এলাকায় মজবুত সরকারী খাদ্য গুদাম, সরকারী ডিসপেন্সারী ও জরুরী ঔষধ সরবাহ কেন্দ্র স্থাপন, রেডিও টিভিতে জনগণের দ্রুত খবর প্রচার ব্যবস্থা, সতর্কী করণ ব্যবস্থা, বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয় সাধন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ভৌগোলিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সামাজিক ও মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে বন্যা ব্যবস্থাপনার ও পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করণ (৬) বন্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভূমি ব্যবস্থা, বীজ বপন, শষ্যকর্তন প্রভৃতি সময়ের পরিবর্তন, বন্যা প্রবন এলাকায় কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করতে হবে। (৭) বন্যার পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে সামঞ্জস্য রেখে বোরো, আমন, আউশ ধানের উৎপাদনের ব্যবস্থাকরণ, শীত মৌসুমে রবিশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা, কৃষকদের ঘরবাড়ি, গবাদী পশু খাদ্যশস্য বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সর্বশেষ প্রাকৃতিক দূর্যোগের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে।

পাঠসংক্ষেপঃ

বন্যা একটি ভয়াবহ দূর্যোগ যা বাংলাদেশে নিয়ত ঘটনা বলে পরিচিত। ইহা পরিবেশগত অবস্থাসহ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় রূপে চিহ্নিত। একদিকে যেমন ইহা যাতায়াত ব্যবস্থা, মৎস্যখাত ও মৃত্তিকার উর্বরতা ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তেমনি আবার ইহা মানুষের ক্ষেতের শস্যসহ জানমালের ব্যাপক ধ্বংসলীলয় তৎপর থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২:৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ**

১.১. অতি সম্প্রতি ২০০৪ সালে .... প্রায় .... বন্যার কবলে পড়ে এবং ব্যাপক .... করে।
১.২. সমভূমি .... ও মোহনায় কিছু .... প্রায়ই .... লেগে থাকে।
১.৩. বন্যা হলো .... ক্ষমতার অতিরিক্ত .... যা নদীখাত দিয়ে .... ভূমি বা জনপদকে .... করে।
১.৪. বন্যা সাধারণত .... সমভূমি .... বেশি হয়।
১.৫. গ্রীষ্মের অধিক .... হিমালয় .... প্রচুর ....গলাতে শুরু করে।
১.৬. ২১ শে মার্চ সূর্যের .... অতিক্রমের পর .... দ্রুত উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।
১.৭. ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ের ফলে .... অনেকাংশে .... হয়ে যায়।
১.৮. বর্ষার পানি নেমে যাবার মতো পর্যাপ্ত খাল, ... না থাকায় পানি এসে .... সৃষ্টি করে।
১.৯. বন.... করার ফলে পানি নিচে নেমে যাওয়ার মত পর্যাপ্ত ...., ... প্রভৃতি না থাকায় .... জমে .... সৃষ্টি করে।
১.১০. বন্যা কবলিত এলাকায় ...., ... দেখা যায়।
১.১১. বন্যা বাহিত পানিতে .... ভূমির .... বৃদ্ধি পায়।

২. **সঠিক উত্তরের পার্শ্বে 'স' এবং মিথ্যা উত্তরের পার্শ্বে 'মি' লিখুন।**

২.১. বাংলাদেশের বড় বড় নদী এলাকায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হতে দেখা যায়।
২.২. বাংলাদেশের নদীগুলোর পানি পলি মাটিতে সমৃদ্ধ।
২.৩. দেশের অধিকাংশ স্থানেই অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই।
২.৪. বাংলাদেশের অধিকাংশ নদ-নদীগুলো উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি।
২.৫. হিমালয় ও পাহাড়ীয়া অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ কর্তন করে বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে।
২.৬. বন্যার ফলে মাটিতে দস্তা ও তামা জাতীয় সারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুনঃ

১. বন্যার সংজ্ঞা লিখুন এবং এর শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশে বন্যার কারণ আলোচনা করুন।
৩. বাংলাদেশে বন্যার সমস্যা ও তার নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের বন্যা সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।
২. বন্যা কত প্রকার? বাংলাদেশে বন্যার কারণ, শ্রেণীবিভাগ ও সমস্যা আলোচনা করুন।

ইউনিট-২

উত্তরমালা

পাঠ-২.১

১.১. উত্তরঃ পর্যাপ্ত, ঢালবিশিষ্ট, ভূমি।
১.২. উত্তরঃ সরোবর, বৃষ্টির, উৎপত্তি।
১.৩. উত্তরঃ প্রবাহিত, জলধারা, নদী।
১.৪. উত্তরঃ অঞ্চল ভূ-অভ্যন্তরে, নদী তীর, খাত।
১.৫. উত্তরঃ গতিবেগ, ঢালের।
১.৬. উত্তরঃ দক্ষিণ, মায়ানমার, টেকনাফ, নাফ।
১.৭. উত্তরঃ অধিকাংশ, পাহাড়ীয়া, নদী ব্যবস্থা।
২.১. স, ২.২. স, ২.৩. স, ২.৪. স, ২.৫. স,

পাঠ- ২.২

১.১. উত্তরঃ পূর্বদিক, অলকানন্দ, ভাগীরথী, দেবপ্রয়াগ, গঙ্গা।
১.২. উত্তরঃ ঘাঘরা, গন্ডক, কোশী, গঙ্গার।
১.৩. উত্তরঃ ভাগীরথী, কালিনী, হুগলী, বঙ্গোপসাগরে।
১.৪. উত্তরঃ সর্বোচচ, পানি, ৪২০০।
১.৫. উত্তরঃ জীবনযাত্রা, বসতি, পরিবহণ।
১.৬. উত্তরঃ অতিরিক্ত পানি, ছেড়ে।

পাঠ-২.৩

১.১. উত্তরঃ শানপো, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা।
১.২. উত্তরঃ কুড়িগ্রাম, নারায়নপুর, মাঝিয়াল, বাংলাদেশে।
১.৩. উত্তরঃ মিলন, ২৭০০।
১.৪. উত্তরঃ দীর্ঘ, উপনদী, মিলিত।
১.৫. উত্তরঃ বালি, সূক্ষ্ম, কনার।
২.১. স, ২.২. স, ২.৩. স, ২.৪. স, ২.৫. স, ২.৬. স, ২.৭. স,

পাঠ-২.৪

১.১. উত্তরঃ প্রভাব, প্রপঞ্চ, নদীর।
১.২. উত্তরঃ মাধ্যমিক, ভিন্ন ভিন্ন, নদীগুলো, আন্তর্জাতিক।
১.৩. উত্তরঃ পর্বত, নাগাপাহাড়, মনিপুর।
১.৪. উত্তরঃ আসাম রাজ্যের, কাছাড়, শিলচরের, অমলশিদ।
১.৫. উত্তরঃ মালভূমি, নদী, পানি প্রবাহ, সুরমার।
১.৬. উত্তরঃ কুশিয়ারা, আজমীরিগঞ্জের, মেঘনা, নদী , হাওড়।
১.৭. উত্তরঃ নদীর, পাহাড়ী, জলধারা।
১.৮. উত্তরঃ উপমহাদেশের, বৃষ্টিবহুল অঞ্চল, বৃষ্টিপাতের।
১.৯. উত্তরঃ অপেক্ষা, বড়, প্রশস্ততম।
১.১০. উত্তরঃ সীমান্তবর্তী, মেঘনা, গুরুত্বপূর্ণ।
২.১. স, ২.২. স, ২.৩. স, ২.৪. স, ২.৫. স,

পাঠ-২.৫

১.১. উত্তরঃ দেশের, ৭৫ ভাগ, ক্ষতি সাধন।
১.২. উত্তরঃ অঞ্চলে, উজানে, বন্যা।
১.৩. উত্তরঃ ধারণ, পানি প্রবাহ, উপচিয়ে, পার্শ্ববর্তী প্লাবিত।
১.৪. উত্তরঃ প্লাবন, অঞ্চলে।
১.৫. উত্তরঃ উত্তাপে, পর্বত, অঞ্চলে, বরফ।
১.৬. উত্তরঃ নিরক্ষরেখা, উত্তর, গোলার্ধে।
১.৭. উত্তরঃ নদীখাত, ভরাট।
১.৮. উত্তরঃ শাখানদী, পয়োনালী, সাময়িক, বন্যার।
১.৯. উত্তরঃ নিধন, খাল, শাখানদী, পানি, বন্যার।
১.১০. উত্তরঃ বিভিন্ন রোগ ব্যাধি।
১.১১. উত্তরঃ কৃষি, উর্বরতা।
২.১. স, ২.২ ২.৩. স, ২.৪.. স, ২.৫. স